পাক্ষিক     ঈদ সংখ্যা

ان الدين عند الله الاسلام

# আহমদী

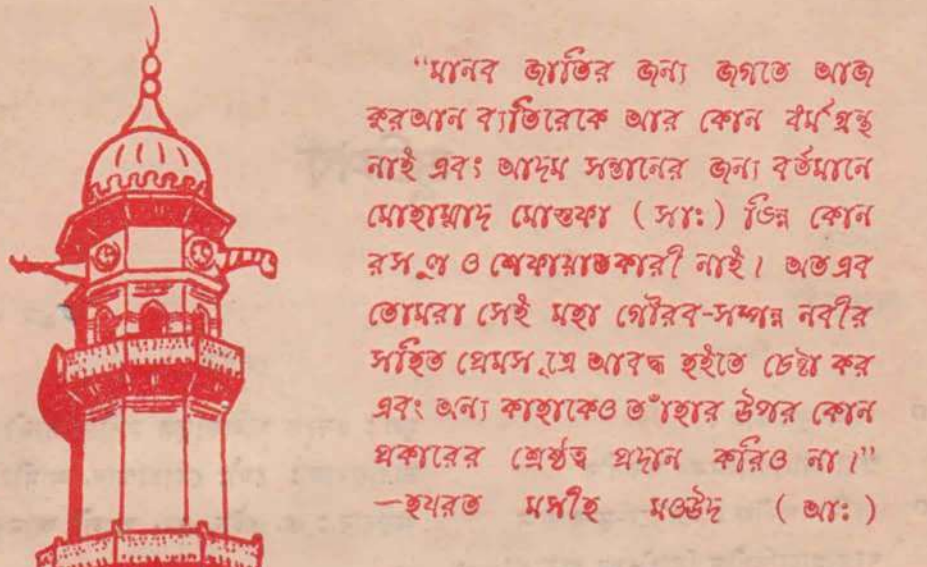

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার
নব পর্যায়ের ৩০শ বর্ষ : ৯ম ও ১০ম সংখ্যা

২৯ শে ভাদ্র, ১৩৮৩ বাংলা : ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ ইং : ১৯ শে রমজান ১৩৯৬ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ½ পাউণ্ড

# সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্মদী
৩০শ বর্ষ
৯ম ও ১০ম সংখ্যা

| বিষয় | লেখক | পৃ: |
|---|---|---|
| ০ আল-কুরআন :<br>সুরা আল-মাউনের তফসীর | মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা:)<br>ভাবানুবাদ : মৌ: মোহাম্মাদ, আমীর বা:আ: আ: | ১ |
| ০ হাদিস শরীফ : সর্দারে-দু-জাহান খাতামান্নাবিয়ীন (সা:)-এর প্রসংশা—২ | অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার | ১০ |
| ০ অমৃতবাণী : রোযা রাখার পুরস্কার | হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ ( আ: ) | ১১ |
| ০ ঈদুল ফিত্‌রের খোৎবা :<br>সত্যকার ঈদ পালনের তিনটি উপলক্ষ্য | হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রা:)<br>অনুবাদ: মৌ: মোহাম্মাদ, আমীর বা: আ: আ: | ১৩ |
| ০ হযরত ইমাম মাহ্দী (আ:)-এর সত্যতা | মূল: হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রা:)<br>অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহ্মান | ২২ |
| ০ খোদ্দাম ও আতফালের পাতা (৩) | বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহ্মদীয়া | ২৬ |
| ০ সংবাদ : | আহমদ সাদেক মাহ্মুদ | ৩০ |
| ০ ওয়াশিংটনে হুজুর (আই:)-এর সাংবাদিক সম্মেলন | আহমদ সাদেক মাহমুদ | ৩৩ |
| ০ বিভিন্ন সংবাদ : | শাহ্ মুস্তাফিজুর রহ্মান | ৩৭ |
| ০ সাদকাতুল-ফিৎর বা ফিৎরানা এবং ঈদ ফাণ্ড | | ৪০ |

بسم الله الرحمن الرحيم     نحمده ونصلي على رسوله الكريم     وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

# আহমদী

ঈদ সংখ্যা

নব পর্য্যায়ের ৩০শ বর্ষ : ৯ম ও ১০ম সংখ্যা

৩০শে ভাদ্র, ১৩৮৩ বাং : ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ ইং : ১৫ই যহুর, ১৩৫৫ হিজরী শামসী

## তফসীরুল কুরআন

## সূরা আল্-মাউন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মূল : হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ);

ভাবানুবাদ : মোহ্তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ।

ذالك الذي يدع اليتيم o সেই ব্যক্তিই এতীমকে ধিক্কার দেয়।

পূর্ববর্তী আয়াতে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, দীনকে যে অস্বীকার করে, সেই এতীমকে ধিক্কার দেয়। পূর্ববর্তী আয়াতে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি কোন বিশেষ এক ব্যক্তিকে বা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে বুঝায় নাই, বরং পবিত্র কুরআনের প্রত্যেক পাঠককে উদ্দেশ্য করিয়া দীনের অস্বীকারকারীর পরিচয় ব্যক্ত করা হইয়াছে। পবিত্র কুরআনে কোন কোন আয়াত সোজা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করিয়া বলা হইলেও বিষয়বস্তু তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই, বরং সকল মুসলমানকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে। যথা ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما o অর্থাৎ "হে মোহাম্মদ (সাঃ)! তুমি তোমার পিতামাতা বৃদ্ধ হইলে, তাহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া আহ পর্যন্ত বলিও না এবং তাহাদিগকে ধমক দিও না, বরং তাহাদিগকে মধুর ভাষণে সম্বোধন কর।" সুস্পষ্টতঃ এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল হযরত রসুল করীম (সাঃ) নহেন। কারণ জন্মের পূর্বে তাঁহার পিতা মারা যান এবং শৈশবে তাঁহার মাতা মারা যান। এক বচনে সম্বোধন থাকায়, উক্ত আয়াত প্রত্যেক পাঠক মুসলমানকে ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। এইভাবে এক বচনের সম্বোধন বিষয়টির গুরুত্বকে বহুগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে। উক্ত আয়াতে বহু বচন ব্যবহার হইলে

বিষয়টির গুরুত্ব কমিয়া যাইত। সাধারনতঃ মানুষ বৃদ্ধ হইলে মেজাজ খারাপ হইয়া যায়। আল্লাহ্‌তায়ালা উক্ত আয়াতে এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে, উক্তরূপ অবস্থাতেও পিতামাতার প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার করা চলিবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য উক্ত উপদেশ মধ্যম পুরুষ এক বচনে দেওয়া হইয়াছে।

মোট কথা পূর্বে আমরা যেভাবে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি যে, যে ব্যক্তি দীনকে অস্বীকার করিবে সে নানাবিধ পাপে লিপ্ত হইবে, কার্যতঃ আজ সারা দুনিয়ায় তাহা পরিদৃষ্ট হইতেছে। দীনের অস্বীকারের ফলে সারা দুনিয়া গ্লানিতে ভরিয়া গিয়াছে। এতীমকে দূর দূর ছি ছি করা ও তাহার সহিত মন্দ ব্যবহার আল্লাহ্‌তায়ালার দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট আচরণ। আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআন পাকে বলিয়াছেন : فاما اليتيم فلا تقهر "এতীমের প্রতি রুষ্ট ব্যবহার করিও না।" (সুরা দুহা)। পবিত্র কুরআনে যেখানে যেখানে এতীমের উল্লেখ আসিয়াছে সেইখানে তাহাদিগকে তিরস্কার না করার এবং তাহাদিগের প্রতি রুষ্ট ব্যবহার না করার আদেশ আসিয়াছে। ইহাতে লোকে প্রশ্ন তুলিয়াছে যে, এইরূপ আদেশ কি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর স্বয়ং এতীম হওয়ার প্রতিক্রিয়ার ফল। যাহারা কুরআন মজিদকে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অন্তরের ধ্বনী মনে করে, তাহারাই এই প্রশ্ন উঠাইয়াছে। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একদল মুসলমান এবং অপর দল হইল অমুসলমান। মুসলমান দল বলিয়া থাকে, যেহেতু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর চিত্ত পবিত্র ও নির্মল ছিল, সেই জন্য যখন তিনি দুনিয়ার গ্লানি দেখিলেন, তখন তাঁহার মর্ম ব্যথিত হইয়া উঠিল, হৃদয়ে এক উদ্দীপনার সৃষ্টি হইল এবং তিনি উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনী তুলিলেন। আঁ হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র হৃদয় হইতে উত্থিত এই ধ্বনীই আল্লাহ্‌তায়ালার আওয়ায ছিল। পক্ষান্তরে অমুসলমান দলের কথা হইল, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) অত্যন্ত মেধাবী এবং হুঁশিয়ার পুরুষ ছিলেন। যখন তিনি দুনিয়াকে উৎপীড়ন, গ্লানি ও পাপে পরিপূর্ণ দেখিলেন, তখন তাঁহার মনে ইহার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল, ফলে তিনি যে সকল কথা বলেন, উহাই কুরআন করীম। কিন্তু নউযুবিল্লাহ তিনি অজ্ঞতাবশতঃ উহাকেই খোদার কালাম মনে করিয়া বলেন যে এগুলি খোদার নিকট হইতে ইলহাম রূপে আমার উপর নাযেল হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইলহাম ইত্যাদি কিছুই তাঁহার উপর নাযেল হয় নাই। যেহেতু তাঁহার আত্মা পবিত্র ছিল, সেই জন্য উহা হইতে কেবল ভাল কথাই সৃষ্ট হইত। ইহাকেই তিনি খোদার তরফ হইতে বলিয়া মনে করিতেন এই প্রকার যুক্তিমূলে প্রশ্নকারী-দলের আপত্তি এই যে, এতীম সম্পর্কিত পুনঃ পুনঃ সতর্কবাণী ও আদেশাবলী

তাঁহার এতীম মনের প্রতিক্রিয়া তো নহে? প্রত্যেক কাজের একটা প্রতিক্রিয়া আছে। ইহার ফলে মানুষ কখনও উহার বিপরীত কাজ করে, আবার কখনও উহার অনুরূপ কাজ করে। কতক লোক আছে যাহারা অনেককে যুলুম করিতে দেখিয়া, তাহারাও পরিবেশের প্রভাবে যুলুম করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহাদের মনে প্রতিক্রিয়ার ধারা হইল এই যে, তাহারা যালেমদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইতেছে। পক্ষান্তরে এরূপও হয় যে, যুলুম দেখিয়া কতক লোকের মনে ইনসাফের রুহ সৃষ্টি হইয়া যায়। যুলুমের বিরুদ্ধে তাহাদের মনে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং উহার বিরুদ্ধে তাহারা সর্বপ্রকার কুরবানী পেশ করিতে প্রস্তুত হইয়া যায়। সুতরাং মনস্তত্বের নিয়মের দিক দিয়া মানুষের মনে কোন কাজের যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, উহা কখনও মূল কাজের অনুরূপ হয় অথবা বিপরীত হয়। আপত্তিকারীগণের বক্তব্য এই যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মনে ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি এতীম হওয়ার কারণে লোকে তাঁহার উপর যুলুম করিয়াছিল। ইহারই ফলশ্রুতিতে তিনি এতীমগণের প্রতি যত্ন করিবার শিক্ষা দেন। আপত্তিকারীগণের মতে এগুলি খোদার কালাম নহে বরং তাঁহার এতীম হওয়ার মানসিক প্রতিক্রিয়ার আওয়ায। তাঁহার মন এই যুলুমের প্রতিশোধ লইতে চাহিল এবং তাঁহার মনে উদ্দীপনার সৃষ্টি হইল। তিনি দেখিলেন তাঁহার ন্যায় আরও বহু এতীম আছে, যাহারা যুলুমের শিকার হইয়া আছে। তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকারে উৎপীড়ণ করা হয় এবং বহুবিধ কষ্ট দেওয়া হয়। ইহা দেখিয়া তিনি মনস্থির করেন যে, তিনি ইহার প্রতিশোধ লইবেন, তিনি যালেমদিগকে অভিযুক্ত করিবেন, তাহাদের কীর্তি প্রকাশ করিয়া দিবেন এবং এতীমদিগকে সাহায্য করিবেন। তদনুযায়ী তাঁহার মনে উদ্দীপনার সৃষ্টি হইল এবং তাঁহার পবিত্র অন্তর হইতে স্বাভাবিকভাবে এক আওয়ায নির্গত হইল, যাহাকে তিনি নউযুবিল্লাহ অজ্ঞতাবশতঃ ইলহাম মনে করিলেন।

বস্তুতঃ এ কথা মোটেই সত্য নহে যে, কুরআন করীম আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অন্তরের আওয়ায এবং ইহাও সত্য নহে যে, তাঁহার শিক্ষা তাঁহার মনের উপর যুগ-গ্লানির প্রতিক্রিয়া-ধ্বনী ছিল। যদিও ধর্ম বিশ্বাসের দিক দিয়া আমরা মানি যে কুরআন করীম আল্লাহতায়ালার কালাম, কিন্তু যাহেরী এলেমের দিক দিয়াও আমরা একীন রাখি যে, কুরআন করীম কোন কাজের মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়ার ফল নহে। সুতরাং সন্দীহান মুসলমানদের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, কুরআন করীম হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর কালাম নহে, বরং আল্লাহতায়ালার কালাম। তাহাদের মনস্তাত্বিক যুক্তি সর্বৈব ভ্রান্ত। খোদাতায়ালাও কি এতীম ও মিসকীন ছিলেন যে, জনগণের যুলুমের কারণে তাঁহার মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উপর তাঁহারও মনের প্রতিক্রিয়ার কথা প্রকাশ করিলেন।

অমুসলমান অবিশ্বাসীগণের নিকট আমাদের উত্তর এই যে, কুরআন মজিদের দাবী বাদ দিলেও যুক্তির দিক দিয়া তাহাদের আপত্তি সঠিক নহে। কারণ এতীমগণের সম্পর্কে কুরআন মজিদের শিক্ষা প্রতিশোধ-মূলক নহে, বরং সংশোধনমূলক। এতদ্ব্যতিরেকে আমরা হযরত রসুল করীম (সা:)-এর এতীমী যামানার পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, তাঁহার এতীমী অবস্থা এরূপ ছিল না, যে জন্য তাঁহার মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে। যদি পিতামাতা ছাড়া তাঁহার অন্য আত্মীয় না থাকিত অথবা যদি তাহারা তাঁহার উপর যুলুম করিত, কষ্ট দিত ও কঠোর ব্যবহার করিত, তাহা হইলে তাঁহার শিক্ষা সাংশোধনমূলক না হইয়া প্রতিশোধমূলক হওয়া উচিৎ ছিল। আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার জীবনে এরূপ সময় কখনও আসে নাই, যখন তিনি তাঁহার এতীমী অবস্থা উপলব্ধি করার অবসর পাইয়াছিলেন। যদিও তিনি এতীম ছিলেন, তথাপি আল্লাহ্-তায়ালা তাঁহার জন্য এমন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার এতীমী অনুভব করেন নাই। তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার দাদা তাঁহাকে পুত্রবৎ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার মাতার প্রতিপালনে রাখেন। তাঁহার দাদা তাঁহাকে তাঁহার মাতার নিকট হইতে ছিন্ন করিয়া লয়েন নাই এবং কতক যালেম যেরূপ প্রতিপালনের নামে উৎপীড়ণ করিয়া থাকে, তিনি তাহা করেন নাই। আবদুল মুত্তালেব যদি তাঁহাকে তাঁহার মাতার ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া লইতেন, তাহা হইলে এক দিকে তাঁহার মাতার মনও পীড়িত হইত এবং তাঁহার মনেও ইহার প্রভাব পড়িত। এইরূপ ক্ষেত্রে মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়ার প্রশ্ন উঠিতে পারিত। যদি তিনি অপরাপর ছেলেদেরকে মাকে ডাকিতে ও তাহার আদর পাইতে দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মনে বাসনা জাগিত, "হায়! আমারও যদি পিতা থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনও আমাকে মায়ের কোল হইতে ছিনাইয়া লইতেন না।" কিন্তু আবদুল মুত্তালেব এরূপ হৃদয়হীনতার কাজ করেন নাই। পিতা না থাকায় তাঁহাকে তাঁহার মাতার প্রতিপালনে রাখিয়া তাঁহার অভাব অভিযোগের দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেন। সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাঁহার মনে এতীমীর জন্য কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার কারণ ছিল না। মক্কাবাসীদের প্রথা অনুযায়ী শিশুদিগকে কিছু কালের জন্য মক্কার বাহিরে খোলা গ্রাম্য আবহাওয়ায় পাঠানোর নিয়ম ছিল, যাহাতে তাহাদের ভাষা এবং স্বাস্থ্য ভাল হয়। মক্কার বাহিরে গ্রামের ভাষা খুব প্রাঞ্জল ছিল আরব ও অপরাপর দেশের মধ্যে এই প্রভেদ ছিল যে, অপরাপর দেশে শহরের ভাষা শুদ্ধ হইত এবং গ্রামীন ভাষা অশুদ্ধ হইত, কিন্তু আরব দেশে ইহার উল্টা ছিল। সে দেশে গ্রামের ভাষা শুদ্ধ ছিল এবং শহরের ভাষা অশুদ্ধ। ইহার কারণ এই যে, গ্রাম এবং শহরের ভাষা একই এবং আরবী হইলেও, সেখানে শহরে বিভিন্ন দেশের লোক সমাগম হওয়ায় শহরের ভাষায় নানাদেশের শব্দ মিশ্রিত হইয়া যাইত, কিন্তু গ্রামে এরূপ হইবার উপায় ছিল না বলিয়া সেখানকার ভাষা শুদ্ধ থাকিত।

সেই জন্য আরবে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেদেরকে গ্রামে রাখার নিয়ম ছিল, যাহা তাহাদের মধ্যে শুদ্ধ ভাষার বুনিয়াদ পড়িয়া যায় এবং তাহাদের স্বাস্থ্যও ভাল হয় এই কাজের জন্য গ্রামের মেয়েরা শহরে আসিয়া ছেলে লইয়া যাইত এবং তাহাদিগ পাঁচ বৎসর প্রতিপালন করিয়া দিয়া যাইত। হযরত রসুল করীম ( সাঃ )-এর জন্য তাঁহার মাতা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন গ্রাম্য মেয়েরা ছেলে লই আসিল, তখন তাহারা তাঁহাকে এই ভাবিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল তিনি এতীম, তাঁহাকে প্রতিপালন কবিলে ভাল বিনিময় পাওয়া যাইবে না। যেমন গ্রামে মেয়েরা ধনীর ছেলের অনুসন্ধান করে, তেমনি প্রত্যেক পিতাও জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া দেখিয় লয় যে, যাহাকে সে ছেলে সোপর্দ করিবে তাহার অবস্থা স্বচ্ছল কিনা। ইহা এই জ যে, ছেলে যেন সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকে এবং স্বাস্থ্যবান হইয়া গড়িয়া উঠে। তদনুযা সে দিন যত গ্রাম্য ধাত্রী আসিয়াছিল, একজন ব্যাতিরেকে সকলে বিভিন্ন গৃহ হইতে ছে লইয়া চলিয়া গেল। ধাত্রী হালিমা গরীব ছিলেন। তিনিও প্রথমে হযরত রসুল করী (সাঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার দারিদ্রেব কথা শুনিয়া কেহ তাহা সন্তান দিতে রাজি হয় নাই। সুতরাং হযরত রসুল করীম (সাঃ) এতীম হওয়ার কার একদিকে যেমন সকল ধাত্রী তাঁহাকে গ্রহণ করিল না, অপর দিকে তেমনি ধাত্রী হালিম গরীব হওয়ার কারণে কেহ তাঁহাকে ছেলে দিল না। পরিণামে হালিমা হযরত রসু করীম (সাঃ)-এর মাতার নিকট আসিয়া বলিলেন, ''আমেনা, আমি আপনার বাচ্চা পাল করিব।" তাঁহার মাতাও অপর কোন ধাত্রী না পাওয়ার কারণে বাচ্চা তাঁহা সোপর্দ করিলেন। ইহা এক ইলাহী তদ্বীর ছিল। কারণ তাঁহাকে গ্রামে লইয়া গিয় প্রতিপালনের জন্য যদি কোন ধাত্রী না পাওয়া যাইত, তাহা হইলে তাঁহার উন্নত স্বাস্থ্য লাভ ও ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হইত না এবং তাঁহার মনে দুঃখ হইত যে এতীমীর জ তিনি এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়ায় তিনি মনে মনে সংক করিতে পারিতেন যে, উত্তরকালে তিনি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু এরূ পরিস্থিতির উদ্ভব না হওয়ায় এতীমীর প্রতিক্রিয়া কিভাবে তাঁহার মনে সৃষ্ট হইল?

বাকী থাকিল ধাত্রী হালিমার গরীব অবস্থার কথা। এ ব্যাপারে এক আলৌকি ঘটনা ঘটিল। হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাঁহার গৃহে আগমনের পরে, তাঁহার অবস্থ দ্রুত স্বচ্ছল হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া হালিমার স্বামী এবং গৃহের ছোট বড় সকলে হযর রসুল করীম (সাঃ)-এর একান্ত অনুরাগী হইয়া গেল এবং তিনি অত্যন্ত আদরে লালি পালিত হইতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহার বালক মনে প্রতিপালন সম্বন্ধেও অসুবিধা জনি

কোনরূপ প্রতিক্রিয়ার সুযোগ ঘটিতে পারে নাই। অতঃপর তিনি যখন ঘরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার দাদাও তাঁহার গুন-মুগ্ধ, হইয়া তাঁহাকে অতি যত্ন সহকারে পালন করিতে থাকেন।

তাঁহার মাতার মৃত্যু হইলে, তাঁহার দাদা নিজের নিকট আনিলেন। আবদুল মুত্তালেব এরূপ রাশ-ভারি লোক ছিলেন যে, তিনি যখন মজলিসে বসিতেন, তখন তাঁহার দিকে কেহ চক্ষু তুলিয়া কথা বলিতে পারিত না। আরবদেশে বড়দের খুব সম্মান ছিল। কিন্তু হযরত রসুল করীম (সাঃ) বাল্যকালে খেলিতে খেলিতে কখনও আসিয়া দাদার স্কন্ধে চড়িয়া বসিতেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার চাচা আবু তালেব, তাঁহাকে লাল চক্ষু দেখাইয়া স্কন্ধ হইতে নামিবার জন্য ইশারা করিতেন। আবদুল মুত্তালেব ইহার প্রতিবাদে নিজ পুত্রকে বলিতেন, "খবরদার! আমার এই বাচ্চাকে কিছু বলিও না।" এইভাবে কোন সময়ে তাঁহাকে এতীমী-জনিত মর্ম-পীড়া ভোগ করিতে হয় নাই, যদ্বারা তাঁহার মনে কোনরূপ প্রতিক্রিয়ার ছায়াপাত হইতে পারিত।

তিনি যখন ৮/৯ বৎসর বয়সের, তখন তাঁহার দাদা মারা যান। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে আবদুল মুত্তালেব তাঁহার পুত্র আবু তালেবকে ডাকিয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সম্বন্ধে উপদেশ দেন, "আমার পুত্রগণের মধ্যে আমি তোমাকে বেশী বিশ্বাস করি। এই বাচ্চা তোমার নিকট আমার আমানত। নিজ সন্তানের ন্যায় ইহাকে পালন করিও। তাঁহার মনে কখনও কোন আঘাত দিও না। আবু তালেবও তাঁহার উপর পিতাকর্তৃক অর্পিত আমানতের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে নিজ পুত্রগণ অপেক্ষা বেশী আদর স্নেহ করিতেন। তিনি তাঁহাকে 'আমার ছেলে' বলিতেন। নিজ সন্তানদের সম্বন্ধে তিনি এরূপ বলিতেন না।

ইতিহাসে দেখা যায়, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বাল্যকাল হইতে পরম গাম্ভীর্যের অধিকারী ছিলেন। ইতিহাসে তাঁহার প্রতি তাঁহার চাচীর স্নেহ প্রদর্শন সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ না থাকিলেও, দেখা যায় যে, তিনি যখন তাঁহার সন্তানদের মধ্যে কিছু বন্টন করিতেন, তখন তিনি তাঁহাকেও একাংশ দিতেন। মায়ের হাতে কোন খাবার দেখিলে, ছেলেরা তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত, কিন্তু হযরত রসুল করীম (সাঃ) এক দিকে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতেন। এমনি কোন এক সময়ে আবু তালেব আসিয়া তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিলে, এই ভাবিয়া যে হযরত নবী করীম (সাঃ) হয়ত ভাবিতেছেন যে, এ গৃহে তাঁহার স্থান নাই, তিনি পরম স্নেহে তাঁহার হাত ধারিয়া স্ত্রীর নিকট গিয়া বলিতেন, "তুমি আমার বাচ্চাকে কিছু দাও নাই। তাহাকে তাহার অংশ দাও।" কিন্তু

তাঁহার এক পার্শ্বে বসিয়া থাকার এ অর্থ ছিল না যে, তিনি নিজ এতীমীর কথা স্মরণ করিয়া এরূপভাবে বসিয়া থাকিতেন, বরং উহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্যের পারিচায়ক ছিল। মোট কথা আগাগোড়া তাঁহার অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি যে এতীম, তাঁহার মনে এ দাগ কাটিবার কোন উপলক্ষ্য সৃষ্টি হয় নাই। তাঁগার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, তাঁহার আত্মীয়গণ ঘরে বাইরে সকলে তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। সুতরাং এতীমদের জন্য তিনি যে শিক্ষা দিয়াছেন উহার ভিত্তি প্রতিশোধমূলক বা মনস্তাত্বিক কোনটাই বলা যায় না। জোর করিয়া যদি উহাকে মনস্তাত্বিকও বলা যায়, তাহা হইলে উহাকে প্রতিশোধ-মূলক না বলিয়া সংশোধন-মূলফ বলিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইহাই বলিতে হইবে যে, তিনি ভাবিতেন যে তাঁহার আত্মীয় স্বজন এত শরীফ ও স্নেহশীল যে তাঁহাকে তাঁহার এতীমীর অবস্থা স্মরণ করার অবসর দেন নাই। অতএব ইহা আমার কর্তব্য যে, আমিও অপরাপর এতীমদের দুঃখ দূর করিয়া তাহাদের জন্যও এই সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করি। আমাদের যুক্তি এতটুকু স্বীকার করিতে পারে, কিন্তু ইহার অতিরিক্ত এই শিক্ষাকে ব্যক্তি স্বার্থ-মূলক কোন রূপেই বলা যাইতে পারে না। কিন্তু আসল সত্য উহাই, যাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, যুক্তি, প্রমাণ, ঘটনাবলী সাব্যস্ত করিতেছে যে, তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা মানবীয় নহে, বরং আসমানী।

দ্বিতীয় আপত্তি যাহা উঠিতে পারে উহা এই যে, দীনকে অস্বীকার করার স্বভাবজ পরিণতি কিভাবে এতীমদের ধিক্কার হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, দীনের অস্বীকারের ফল এতীমের ধিক্কার নহে, কিন্তু উপরে দীনের অর্থ সম্বন্ধে যে বারটি টিকা দেওয়া হইয়াছে, উহাদের প্রত্যেকটির ফলশ্রুতিতে এতীমের ধিক্কার ও অপরাপর পাপও আসিয়া যায়। দীনের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিলে চলিবে না, বরং উপরে আলোচিত বারটি অর্থ ব্যাখ্যাকে সম্মুখে রাখিতে হইবে।

উহাদের প্রত্যেকটির অস্বীকারের ফল মানুষকে বহুবিধ পাপে লিপ্ত করে এবং এতীমদেরকে ধিক্কার করা বড় পাপের মধ্যে অন্যতম; সকল পাপের মধ্যে আলোচ্য আয়াতে কেবল এই পাপটিকে নির্বাচন করিয়া বলার কারণ এই যে, ইহা কেবল পাপ নহে বরং নীচতা নির্দেশক এবং যে এ কাজ করে, সে মানুষের পর্যায়ের নীচে নামিয়া যায়। দ্বিতীয় কারণ হইল, ইহা জাতীয় অপরাধ। ইহার দ্বারা জাতির শৃঙ্খল ছিড়িয়া যায় এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণের চরিত্র ও বর্তমান বংশধরগণের কুরবানীর উপর অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা এই পাপের নাম অনিবার্য ফল হিসাবে উল্লেখ করেন নাই, বরং বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। অপরাপর পাপ এক সীমার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু এই পাপ সমস্ত জাতি ও মানব সমাজকে আঘাত করে ও জাতির ও

মানবতার অধঃপতন ঘটায় এবং এই পাপের ফল সুদূর প্রসারী। ব্যক্তিবর্গের কুরবানীর ফলে জাতি গঠিত হয় এবং সন্তান সন্ততি তাহাদের উত্তরাধীকার হইয়া থাকে। মানুষ জাতির জন্য জীবন দিয়া থাকে। যদি সে দেখে যে, সে মরিয়া গেলে তাহার পুত্র সন্তানদের কেহ প্রতিপালন করিবে না এবং তাহারা নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা হইলে সে কুরবানী করিতে পরাম্মুখ হয়। কেবল নিজের প্রাণ দিবার প্রশ্নে মানুষ পরওয়া না করিয়া আগাইয়া যায়, কিন্তু যখন বংশধরগণের প্রশ্ন আসিয়া যায়, তখন সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া যায়। যুবকগণ প্রাণদান করিতে এই জন্য আগাইয়া আসে যে, হয় তাহারা বিবাহিত নহে, অথবা তাহাদের সন্তান সন্ততি থাকে না। ভবিষ্যতের জন্য তাহাদের কোন চিন্তা বা বাধা বিপত্তি থাকে না। পক্ষান্তরে বিবি বাচ্চাওয়ালা বয়োঃবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ চিন্তা করে যে, তাহারা মারা গেলে, তাহাদের পরিজনগণের কি অবস্থা হইবে, কে তাহাদের এতীম ছেলে মেয়েদের প্রতিপালন করিবে, এবং তাছারা নিজেরা তাহাদের ব্যবস্থা না করিয়া গেলে, তাহারা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তাহাদের মনে যখন এই সব চিন্তা উঠে, তখন তাহারা কুরবানী করিতে পশ্চাদপদ হয়। কিন্তু জাতির পক্ষ হইতে যদি এতীমগনের প্রতিপালনের সুব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে, আর কেহই কুরবানী দিতে ইতস্থতঃ করিবে না। যে কোন আহ্বানে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত মনে অচিরাৎ সাড়া দিবে। ইহার দ্বারা জাতির ভবিষ্যত উন্নতি নিশ্চিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ যে জাতি এতীমগণের প্রতিপালনের জন্য যত বেশী সুন্দর ব্যবস্থা রাখে, সেই জাতির উন্নতির মান তত উন্নত ও উচ্চ হয়।

কেবল ধর্ম বিধানেই এতীমগণের প্রতিপালনের ব্যবস্থা নাই, বরং জাগতিক দিক দিয়াও তাহাদের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে এতীমগণের প্রতিপালনের জন্য বড়ই সুব্যবস্থা রহিয়াছে। অনেকে নিজেদের জীবন দিয়া তাহাদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। অনেকে এ কার্যে তাহাদের জীবন ওয়াকফ করিয়া দেয়। তাহারা বড় বড় এতীমখানা খুলিয়া এবং প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়া এতীমখানায় এতীমগণের প্রতিপালন করে। কিন্তু আমাদের দেশে অর্থোপার্জনের জন্য এতীমখানা খোলা হয় এবং ছেলেদের ভিক্ষা মাগিরার কাজে নিয়োজিত করা হয়। কোন জাতির কুরবাণীর মান ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়িতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের মধ্যে এতীমগণের প্রতিপালনের জন্য সুব্যবস্থা করা হয়। সেই জন্য আল্লাহ্তায়ালা এই প্রয়োজনের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন যে, দীনের যে কোন অর্থই লওয়া যাউক না কেন, যে ব্যক্তি দীনকে অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি ও জাতি সম্পর্কিত নেকীসমূহ হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একটি হইল এতীমগণের প্রতিপালন এবং অপটি হইল দরিদ্রগণকে সাহায্য। যে ব্যক্তি দীনকে মানে, তাহার মধ্যে ব্যক্তিগত পবিত্রতা এবং জাতির জন্য দরদ থাকে। সে অপরাপর নেকীর সহিত এতীম ও দরিদ্রগণের প্রতি তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ থাকে এবং বুঝে যে, এই কর্তব্য উপেক্ষা করিলে, তাহার কুফল তাহার ও তাহার সন্তানগণের উপর বর্তিবে।

হযরত রসুল করীম ( সাঃ )-এর যামানায় এতীমগণের প্রতিপালনের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। পক্ষান্তরে মুশরেকগণের এতীম ছেলেমেয়েদের প্রতি নযর করিবার কেহ ছিল না। মদীনায় এতীমগণকে মাথায় তুলিয়া রাখিত। সেই জন্য মদীনার অধিবাসীগণ কুরবানী করিতে ভীত হইত না। তাহাদের মনে এ চিন্তা উদয় হইত না যে, তাহারা মারা গেলে তাহাদের সন্তানদের কে দেখাশুনা করিবে। কিন্তু মক্কার মুশরেকগণ ভয় করিত যে, তাহাদের সন্তানদের দেখাশুনা করার কেউ থাকিবে না। আজকাল কোন স্ত্রীলোক বিধবা হইলে, তাহাকে ও তাহার ছেলেমেয়েদিগকে ভরণ পোষণ করার ভয়ে কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে অগ্রসর হয় না। অথচ সে যুগে কেহ বিধবা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ও তাহার বাচ্চাদের ভার গ্রহণের জন্য বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিয়া যাইত। স্বয়ং হযরত রসুল করীম (সাঃ কতিপয় বিধাবার পানি গ্রহণ করেন এবং এতীমগণের প্রতিপালন করেন। একদা হযরত রসুল করীম (সাঃ) এক নব্য যুবককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কোন যুবতীকে বিবহ কর নাই কেন?" সে উত্তর দিয়াছিল, "হে আল্লাহর রসুল! গৃহে আমার মৃত ভাইয়ের এতীম ছেলেমেয়ে আছে। তাহাদের প্রতিপালনের জন্য এক অভিজ্ঞা স্ত্রীলোকের প্রয়োজন ছিল। তাই আমি এক বিধবাকে বিবাহ করিয়াছি।" যখনই কোন সাহাবী শহীদ হইতেন, অথবা মৃত্যু বরণ করিতেন, তখনই লোক হযরত রসুল করীম ( সাঃ )-এর নিকট আসিয়া বিধবার ও তাহার এতীমগণের ভরণ পোষণের উদ্দেশ্যে বিবাহের দরখাস্ত পেশ করিয়া দিত। সুতরাং সে যুগে কোন এতীমের অসহায় থাকার কোন প্রশ্নই ছিল না।

হযরত রসুল করীম ( সাঃ ) যখন কোন কাজে পথ দিয়া চলিয়া যাইতেন, তখন কখনও কখনও কোন এতীম ছেলে তাঁহাকে আসিয়া ধরিত এবং তাহার প্রয়োজনের কথা বলিত। হযরত রসুল করীম ( সাঃ ) তাহার ডাকে সাড়া দিয়া বলিতেন, "চল, আগে তোমার কাজ করিয়া দিই" এবং তাহার সঙ্গে যাইতেন। এই জন্য সাহাবা ( রাঃ ) কুরবানী করিতে পশ্চদপদ হইতেন না। তাঁহাদের দৃঢ় প্রতীতি থাকিত যে, তাঁহারা মারা গেলে, তাঁহাদের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের পরিজনের প্রতিপালনের উত্তম ব্যবস্থা হইবে। এরূপ দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় যে, যে সাহবী বিধবা বিবাহ করিতেন তিনি বিবাহের পরেই বিবাহিতা বিধবা স্ত্রীর এতীম বাচ্চাদের নামে তাঁহার সম্পত্তি লিখিয়া দিতেন। এই কুরবানীর ফলশ্রুতিতে সাহাবা ( রাঃ ) জীবন উৎসর্গ করিতে ইতস্তত: করিতেন না। অবশ্য জীবন কুরবানী করার পিছনে ঈমান ও আল্লাহ্তায়ালার সহিত মিলনাকাঙ্খার প্রেরণাও সক্রিয় ছিল। কিন্তু উহার সহিত পার্থিব সুযোগ সুবিধা সংযুক্ত হইয়া গেলে অপূর্ব ফল ফলিয়া থাকে।

আমাদের জামাতেও এ বিষয়ে কমজোরী রহিয়াছে। এতীমগণের দেখাশুনা করা হয় না। এই জন্য আমাদের জামাতের লোকও মরিতে ভয় করে। যদি এতীমগণের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা হইয়া যায় এবং লোকদের মনে বিশ্বাস জন্মে যে, তাহারা মরিয়া গেলে তাহাদের সন্তানগণ বিনষ্ট হইবে না, তাহা হইলে জামাতের মধ্যে কুরবানীর রুহ বাড়িয়া যাইবে। এতীমখানা খুলিলে চলিবে না। কারণ দেখা গিয়াছে যে, এতীমখানা খোলার পর লোকে এতীমদের দিয়া নিজেদের কাজ করাইয়া লইয়াছে। সেই জন্য এই বাচ্চাদেরকে আমি হোষ্টেলে রাখার বেশী পক্ষপাতি। ( ক্রমশঃ )

# হাদিস শরীফ

## সর্দারে দু-জাহান খাতামান্নাবিয়ীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার শাফাআতের মোকাম।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

১। হযরত উম্মুল মোমেনীন সফিয়া ( রাঃ ) বর্ণনা করিতেছেন :—

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক বার এতেকাফে ছিলেন। রাত্রে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম। অনেকক্ষণ কথা বার্তার পর, যখন আমি বিদায় গ্রহণের জন্য উঠিলাম, তখন হুজুর ( সাঃ )-ও আমাকে কিছু দূরে ছাড়িবার জন্য আমার সঙ্গে চলিলেন। আমরা দুইজনই যাইতেছিলাম। পার্শ্বে দুইজন আনসারী যাইতেছিলেন। তাঁহারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সম্মুখে চলিয়া গেলেন। হুজুর ( সাঃ ) তাঁহাদিগকে বলিলেন; "থামো, ইনি আমার স্ত্রী সফিয়া।" ইহাতে ঐ দুই আনসারী যুবক বলিলেন, সুবহানাল্লাহ। হে আল্লার রসুল, আমারা কি আপনার সম্বন্ধে কুধারণা করিতে পারি?" তিনি বলিলেন, "ধমনিতে রক্তের প্রবাহের ন্যায়, শয়তান মানুষের মধ্যে মিশিয়া আছে। আমার আশঙ্কা হইল, এবং চাহিলাম তোমরা যেন কুধারণার বশবর্তী না হও, এবং ( ফলে ) ধ্বংস না হও।"

২। হযরত জুবায়ের বিন মুৎআম (রাঃ) রেওয়ায়েত করিতেছেন :—

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিলেন, "আমি মোহাম্মদ। আমি আহ্মদ। আমি মাহী ( নিশ্চিহ্নকারী ), আমার দ্বারা কুফর ধ্বংস হইবে। আমি হাশের, আমার অনুসরণে লোকের পুনরুত্থান হইবে। আমি আকেব, আমি পরিশেষে আসিয়াছি। আমার পরে কোনো স্বাধীন নবী হইবেন না।"

৩। বর্ণিত হইয়াছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন। "অন্য নবীগণ হইতে ছয়টি বিষয়ে আমার শ্রেষ্ঠত্ব আছে। তত্ব ও তথ্যের পূর্ণ 'কালাম' ( বাণী ) আমাকে দেওয়া হইয়াছে। আমার জন্য যুদ্ধ লব্ধ মাল হালাল করা হইয়াছে। আমার জন্য সব জমীন মসজিদ ও পাক সাফ নির্ধারণ করা হইয়াছে। আমাকে সমগ্র মানব মণ্ডলীর জন্য পাঠান হইয়াছে। এবং আমাকে নবীগণের 'খাতাম' ( মোহর ) করা হইয়াছে।

৪। হযরত জাবের ( রাঃ ) বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

আমার এবং তোমাদের উপমা ঐ ব্যক্তির মত, যে আগুন জ্বালানোর পর উহাতে কীট পতঙ্গ পড়া আরম্ভ করে। ঐ ব্যক্তি এই সব কীট পতঙ্গ আগুন হইতে সরাইতে থাকে, যাহাতে আগুনে দগ্ধ না হয়। তেমনি দোযখের আগুন হইতে রক্ষার জন্য আমি তোমাদিগকে পিছন হইতে ধরি এবং তোমরা আমার হাত হইতে বাহির হইয়া পড়।

( হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থ হইতে ধারাবাহিক অনুবাদ )

অনুবাদক—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

## হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর

# অমৃত বাণী

### রোজা রাখার পুরস্কার অতি মহান তাহাতে সন্দেহ নাই : রোজা হৃদয়ে উজ্জ্বলতা দান করে ও 'কাশফের' দ্বার উন্মুক্ত করে।

১। "আরবী ভাষায় সূর্য্যের তাপকে 'রময' বলা হয়। যেহেতু রমযান মাসে রোজাদার ব্যক্তি পানাহার ও যাবতীয় দৈহিক ভোগ বিলাস হইতে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্‌র আদেশসমুহ পালন করিবার উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণে এক প্রকার ব্যগ্রতার তাপ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, এই আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার তাপের সংমিশ্রনে রমযান বলা হইয়াছে। আমার মতে এই ধারণা সঠিক নহে। কেননা আরব দেশের জন্য ইহাতে কোনও বিশেষত্ব থাকিতে পারে না। আধ্যাত্মিক তাপের অর্থ আধ্যাত্মিক অনুরাগ ও ধর্ম্ম-কর্মে উদ্দীপনা। 'রম্‌য' এমন উত্তাপকেও বলা হয় যদ্বারা পাথর প্রভৃতি পদার্থও উত্তপ্ত হয়।"

(আল-হাকাম—২৪শে জুলাই ১৯০১ইং)

২। "রমযান মাস অতি মঙ্গলজনক মাস। কেননা ইহা দোয়ার মাস" (ঐ)

৩। شهر رمضان الذى انزل فيه القران —কোরআন শরীফের এই একটি মাত্র পবিত্র বাক্য হইতে রমযান মাসের মাহাত্ম্য বুঝা যায়। (এই আয়াতের অর্থ—রমজান সেই পবিত্র মাস, যাহার মধ্যে কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।—অনুবাদক।) সূফীগণ লিখিয়াছেন যে, এই মাসে আত্মাকে জ্যোতির্ময় করার উত্তম সুযোগ পাওয়া যায়। এই মাসে বহুল পরিমাণে 'কাশফ' (আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞান বা দিব্য দর্শন) লাভ হইয়া থাকে।

নামাজ "তায্‌কিয়া-নফ্‌স" (আত্ম-সুদ্ধি) সাধিত করে এবং রোজায় "তাজল্লিয়ে-মল্‌ব" (আত্মার উজ্জলতা)। 'তাযকিয়া-নফ্‌স'-এর অর্থ—রিপু দমন শক্তির বৃদ্ধি লাভ। 'তাজাল্লিয়ে-কল্‌ব' (আত্মার উজ্জলতা) সাধিত হওয়ার অর্থ—"কাশফ" বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দুয়ার উন্মুক্ত হইয়া খোদা-দর্শন লাভ করা।

সুতরাং انزل فيه القران (অর্থাৎ এই মাসে কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে)—পবিত্র আয়াতে ইহারই ঈঙ্গিত রহিয়াছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, রোজার প্রতিদান অতি মহান। কিন্তু দৈহিক অসুস্থতা ও পার্থিব স্বার্থ মানুষকে এই কল্যাণ লাভ হইতে বঞ্চিত রাখে।"

(বদর—১লা ডিসেম্বর—১৯০৮ ইং)।

৪। "কোরআন করীম হইতে ইহাই প্রতিপাদ হয় যে فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر অর্থাৎ—অসুস্থ ও সফররত ব্যক্তির রোজা রাখা সঙ্গত নয়।

ইহা খোদার আদেশ। আল্লাহ্‌তায়ালা এরূপ নির্দ্দেশ দেন নাই যে, রোজা যাহার ইচ্ছা রাখুক অথবা যাহার ইচ্ছা না রাখুক। যেহেতু অধিকাংশ লোক সাধারণতঃ সফরে রোজা রাখিয়া থাকে, সেইহেতু যদি তাহারা প্রচলিত প্রথা বিবেচনা করিয়া রোজা রাখে, তাহা হইলে তাহারা রাখুক কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এতদসত্বেও عدة من ايام اخر ( অর্থাৎ অন্য সময়ে সেই রোজা পুরা করিতে হইবে ) আয়াতে উল্লিখিত আদেশ পালনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। ( আল হাকাম ৩১ শা জানুয়ারী —১৮৯৬ইং )

৫। (ক) "সফরে কষ্ট স্বীকার করিয়া যাহারা রোজা রাখিয়া থাকে তাহারা প্রকারান্তরে আল্লাহ্-তায়ালাকে বল-পূর্বক সন্তুষ্ট করিতে চাহে। আল্লাহর হুকুম মান্য করিয়া আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চাহে না। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। আল্লাহ্‌র আদেশ এবং নিষেধ উভয়ই মান্য করার মধ্যে সত্যিকার ঈমান নিহিত।" ( আল-হাকাম, ৩১শে জানুয়ারী—১৮৯৯ইং )।

(খ) "শরীয়তের ভিত্তি কাঠিন্যের উপর নহে বরং যাহাকে তোমরা সচরাচর সফর বলিয়া থাক তাহাই সফর। যেমন খোদাতায়ালার নির্দ্দেশিত ফরজ ( বাধ্যকর ) বিষয়াবলীর উপর আমল করিতে হয়, তেমনিভাবে তাঁহার অনুমোদিত সুবিধা পালন করাও অবশ্য কর্ত্তব্য।"

( আল-হাকাম, ঐ )

অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

নিশ্চয় জানিও যে, আকাশে কেবল তখনই তোমরা আমার শিষ্যমণ্ডলী বলিয়া পরিগণিত হইবে, যখন তোমরা সত্য সত্যই ধর্মনিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচবারের নামায এরূপ ভীতি সহকারে এবং নিবিষ্টচিত্তে পড়িবে, যেন তোমরা আল্লাহতায়ালাকে সাক্ষাৎভাবে দেখিতেছ। তোমাদের রোযাও নিষ্ঠার সহিত পালন করিবে। তোমাদের মধ্যে যাহারা যাকাত দিবার উপযুক্ত, তাহারা অবশ্য যাকাৎ দিবে। যাহাদের জন্য হজ্জ অবশ্য কর্তব্য এবং ইহা পালনে কোন বাধা নাই, তাহারা অবশ্য হজ্জ করিবে। তোমরা সকল পুণ্য কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবে এবং সকল পাপকে ঘৃণার সহিত পরিহার করিবে। এ কথা নিশ্চয় জানিবে যে, কোন ধর্ম আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হইবে না, যাহাতে প্রকৃত তাক্ওয়া নাই। এই তাক্‌ওয়াই সকল পুণ্যের মূল। যে কর্মে এই মূল ধ্বংস হয় না, সেই কর্ম কখনও ধ্বংস হইবে না। ইহা নিশ্চয় যে, পূর্ববর্তী বিশ্বাসীদিগের মত তোমাদিগকেও নানা প্রকার দুঃখ কষ্টের পরীক্ষা দিতে হইবে। অতএব সতর্ক রহিও, যেন তোমাদের পদস্খলন না হয়। যদি আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ দৃঢ় থাকে, তবে পৃথিবী তোমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না।

( কিশ্‌তিয়ে নূহ্, পৃঃ-২৭ )

# ঈদুল ফিত্‌রের খোৎবা

## সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী ( রাঃ )

[ ইং ১৯৪১ সনের ২৮শে জুলাই তারিখে প্রদত্ত ]

**প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করা যে কেন সে ঈদ পালন করিতেছে। সত্যকার ঈদ পালনের তিনটি উপলক্ষ্য : চেষ্টা কর যেন তোমরা খোদাকে পাও, জাতীয় উন্নতি লাভ কর এবং নৈতিক শ্রেষ্ঠতা অর্জন করিতে পার।**

কলেমা শাহাদত, আউযুবিল্লাহ এবং সুরা ফাতেহা পাঠ করিবার পর হুজুর বলেন :—

ঈদ এমন এক বিষয় যে পৃথিবীর সকল জাতি ইহা পালন করে। কেহ ইহার নাম তাহওয়ার রাখে, কেহ ঈদ এবং কেহ খ্রীস্মাসডে বলিয়া অভিহিত করে। মোট কথা দুনিয়ার এমন কোন জাতি নাই, যাহাদের মধ্যে আনন্দোৎসব নাই। প্রত্যেক জাতি কোন না কোন ভাবে ঈদ পালন করে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, আনন্দোৎসবের আবেগ মানব প্রকৃতিগত। এই আবেগ যদি প্রকৃতিগত না হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক জাতির মধ্যে কেন আনন্দোৎসব করা হয়? শত শত এবং হাজার হাজার বৎসর পর্যন্ত মানুষ পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে। আমেরিকাবাসীগণ পৃথিবীর অন্য জাতির সহিত ততদিন পর্যন্ত মিলিতে পারে নাই, যতদিন পর্যন্ত না কলম্বাস ইহাকে আবিষ্কার করে। অষ্ট্রেলিয়াবাসীগণও এক সময় পর্যন্ত অন্য জাতির সহিত মিলিতে পারে নাই। কিন্তু তবুও সে দেশের ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে, তাহাদের পুরাতন বাসিন্দাদের মধ্যে আনন্দোৎসবের প্রথা ছিল। অনুরূপভাবে আফ্রিকার পুরান বাসিন্দাগণের মধ্যেও তেহওয়ার পাওয়া যায়। যাহা হউক, ঈদের উপলক্ষ্য বিভিন্ন হইলেও ইহার অস্তিত্ব প্রত্যেক জাতি এবং প্রত্যেক দেশে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রকৃতির সহিত ঈদের সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইসলামেও বৎসরে দুই ঈদ রাখিয়াছে। যথা ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া রসুল করীম (সাঃ) জুমার দিনকেও মুসলমানগণের জন্য ঈদের দিন বলিয়া ধার্য করিয়াছেন; ফলে ইসলাম ঈদের দিক দিয়া অন্যান্য জাতি ও ধর্মের তুলনায় অগ্রগামী।

### কিন্তু প্রশ্ন এই যে ঈদ কাহাকে বলে?

নিশ্চয় কোন কারণ আছে যে জন্য প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে ঈদের ব্যবস্থা আছে। ঈদের ব্যবস্থার কারণ ইহাই যে, মানুষ যদি সদা দুঃখকে দেখিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাদের শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। কখনও কখনও তাহাদের দৃষ্টি উচ্চ লক্ষ্য এবং সফলতার দিকেও আকৃষ্ট হওয়া উচিৎ। যদি তাহারা জাতীয় সাফল্যের স্মৃতিকে জাগরুক রাখে এবং নিজেদের লক্ষ্যকে স্থির রাখে, তাহা হইলে তাহাদিগের উদ্দীপনা বাড়িতে থাকিবে এবং এতদ্বারা জাতি মরিবে না। যদি আনন্দোৎসব পালিত না হয়, অথবা আনন্দোৎসব পালিত হয় কিন্তু

উহার কোন উপলক্ষ্য না থাকে, বরং এক গতানুগতিক প্রথা মাত্র হয়, তাহা হইলে জাতি মরিয়া যায়।

## ঐ জাতির আত্মা মরিয়া যায়

এবং কেবল ছবি বাকী থাকিয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঝাড়ূদারগণের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, তাহাদের পিতৃপুরুষ বাদশাহ ছিল। সান্সী জাতির মধ্যেও এরূপ প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায়, এবং এইজন্য তাহারা জুতা পরে না। তাহাদের মতে যখন তাহারা আবার বাদশাহী লাভ করিবে, তখন তাহারা জুতা পরিবে। যাহা হউক, ইহা সত্য যে, এককালে এইসব জাতির মধ্যে বাদশাহ ছিল। হিন্দুস্থানে আর্যদের আগমনের পূর্বে দ্রাবিড় জাতি বাস করিত। সম্ভবতঃ সান্সীগণ ঐ জাতির সহিত সম্বন্ধ রাখিত। কিন্তু তাহারা কেবল প্রবাদবাক্য স্মরণ রাখিয়াছে, কার্যতঃ তাহারা কিছু করে নাই। এইজন্য এই বিষয় শুধু এক প্রাণহীন ছবির আকারে রহিয়া গিয়াছে। বাদশাহাত কখনও আকাশ হইতে আসে না, বরং প্রচেষ্টার ফলে লাভ হয়। কিন্তু তাহাদের মধ্যে আমি কোন প্রচেষ্টা দেখি না এবং তাহারা বাদশাহী পুনরুদ্ধারের জন্য কোন সংগ্রাম করে নাই। সেইজন্য এই জাতি মরিয়া গিয়াছে, তাহারা জীবিত নহে। সুতরাং সাফল্যকে স্মরণ রাখার নিশ্চয় উপকার আছে, তবে শর্ত এই যে, উপলক্ষ্য এবং প্রেরণা থাকা চাই। কিন্তু উপলক্ষ্য ও প্রেরণা যদি না থাকে এবং উহার স্মরণে রক্তে উত্তাপের সৃষ্টি না হয় এবং মৃত শিরাসমূহে জীবনের প্রবাহ খেলিয়া না যায়, তাহা হইলে জানিও যে সেই জাতি বাঁচিয়া নাই, মরিয়া গিয়াছে। উহা এক ছবি মাত্র। উহার মধ্যে বাস্তবতা নাই।

আমাদের দেখা কর্তব্য আমাদের ঈদের পশ্চাতে বাস্তব আনন্দের কোন ভিত্তি পাওয়া যায় কি না? যদি আমাদের ঈদের পশ্চাতে বাস্তব আনন্দের কোন ভিত্তি থাকে, তাহা হইলে উহা আমাদের জন্য কল্যাণের কারণ। কিন্তু যদি তাহা না থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক সমাগত ঈদ, আমাদেরকে পূর্বাপেক্ষা প্রাণহীন করিয়া দিবে। কারণ যে কাজ কেবল নকল স্বরূপ করা হয়, উহা নকলকারদের অন্তরে মরিচা লাগাইয়া দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোন ব্যক্তি যদি তাহার কোন আত্মীয় বা বন্ধুকে দেখিয়া কৃত্রিম কান্না কাঁদে, তাহা হইলে সে একবার কৃত্রিম কান্না কাঁদিতে পারিবে, কিন্তু দ্বিতীয়বার যদিও সে কৃত্রিম কান্না কাঁদিতে থাকিবে এবং তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকিবে, কিন্তু অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কান্নায় হৃদয়ে দুঃখের লেশ থাকে না। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ কান্নায় অভ্যস্ত এবং সে অভ্যস্ত নহে। সেইজন্য সে যদি কোন সময়ে নিজের উপর কৃত্রিম দুঃখের অবস্থা আনে, সে সত্য সত্যই বিষাদিত হয়। সুতরাং যদি ঈদ আসে এবং আমাদের মধ্যে উহার উপলক্ষ্য এবং প্রেরণা আমাদের মধ্যে উত্তাপের সৃষ্টি না করে, আমাদের মধ্যে

জীবনের প্রবাহ খেলিয়া না যায়, তাহা হইলে উহার ফল ইহাই হইবে যে, প্রত্যেক ঈদ আমাদিগকে পূর্বাপেক্ষা বেশী প্রাণহীন করিয়া চলিয়া যাইবে।

কুরআন করীম হইতে জানা যায় যে, ঈদ তিন উপলক্ষ্যের ভিত্তিতে পালন করা হয়। প্রথম—মানুষের যখন তাহার প্রিয়তম অর্থাৎ খোদা লাভ হয়। তাহার খোদা লাভ হইলে, তাহার ঈদ সত্যকার ঈদ হইবে। কিন্তু যদি তাহার খোদা লাভ না হয়, তাহা হইলে ঈদ কিসের? বস্তুতঃ যদি ইসলামের প্রথম যুগে ঈদ কাহারও ছিল, তাহা হইলে সে মুসলমানদের। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, খৃষ্টানগণও খোদাতায়ালার বিশ্বাসী ছিল। হিন্দুগণও খোদাতায়ালার বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু এমন কোন দল নাই যাহারা এ দাবী করে যে, আমরা খোদাকে পাইয়াছি। যদি এমন কোন জামাত ছিল, যাহাদের এ দাবী ছিল যে, আমরা খোদাতায়ালাকে পাইয়াছি, তাহা হইলে সে রসুল করীম (সাঃ) এবং তাঁহার সাহাবা (রাঃ) ছিলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়তমকে লাভ করিয়াছে তাহার ঈদ হইয়াছে। কবি গালেব বলিয়াছেন, প্রকৃত আনন্দ সেই ব্যক্তির, যাহার স্কন্ধে তাহার প্রিয়তম মস্তক ন্যস্ত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং প্রকৃত আনন্দ সেই ব্যক্তির যে খোদাতায়ালাকে দেখিয়াছে এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছে! হযরত মসিহ মওউদ (আইঃ)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি নিজের নোট বুকে বিভিন্ন বিষয় নোট করিতেন এবং পরে ক্ষেত্রানুযায়ী সেগুলিকে মজমুনের আকার দিতেন। যখন আমার জ্ঞানুন্মেষ হইল, তখন আমি ঐ প্রকার নোটের অনুসন্ধান করিতাম, যাহা কোন পুস্তক বা খবরের কাগজে ছাপা হয় নাই। যদি কোন অপ্রকাশিত নোট পাইতাম, তাহা হইলে উহা তশহীযুল আযহান পত্রিকায় ছাপিয়া দিতাম। একদিন আমি তাঁহার নোট বুক হইতে অপ্রকাশিত নোটের অনুসন্ধান করিতেছিলাম। দেখিলাম এক স্থানে লিখা আছে, দুনিয়া আমাকে ভয় দেখায়, দুশমণ আমাকে ধমক দেয়, তাহারা আমাকে আতঙ্কিত করিতে চাহে। কিন্তু আমি আশ্চার্যান্বিত হই যে, তাহারা কেমন করিয়া ভাবে যে তাহারা তাহাদের পরিকল্পনা এবং ভীতি প্রদর্শনে সফলকাম হইবে! যদি কাহারও মধ্যে ভয়ের প্রবণতা থাকে, তাহা হইলে সে ভীত হইবে। কিন্তু আমি যখন বালিশে মাথা রাখি, খোদাতায়ালা আমার নিকট আসেন এবং বলেন, আমি তোমার সঙ্গে আছি। যখন খোদাতায়ালা স্বয়ং আমার নিকটে আসিয়া বলেন যে আমি তোমার সঙ্গে আছি, তখন আমি কি বিরুদ্ধবাদীদেরকে ভয় করি! সুতরাং খোদাতায়ালা যাহার সঙ্গে থাকেন, অপর কাহারও শক্তি নাই যে তাহার কোন ক্ষতি করে।

রসুল করীম (সাঃ)-এর দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। রসুল করীম (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে সঙ্গে করিয়া সওর গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। দুশমনগণ অনুসন্ধান-

কারীদের সঙ্গে লইয়া তাঁহার খোঁজে সওর গুহায় পৌঁছিল। সাধারণ মুসলমানগণের ধারণা অনুযায়ী উহা কোন ছোট গর্ত ছিল, যাহা দেড় গজ লম্বা এবং দেড় গজ চওড়া এক স্থান ছিল। বস্তুতঃ উহাতে চব্বিশ পঁচিশ জন মানুষ বসিতে পারিত। এমন প্রশস্ত জায়গায় দৃষ্টিপাত করা কোন কঠিন কাজ ছিল না। রসুল করীম (সাঃ) এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) এই গুহার মধ্যে একদিকে বসিয়াছিলেন। গুহার মুখে আসিয়া অনুসন্ধানকারীগণ বলিল, যদি মোহাম্মাদ (সাঃ) যমীনে থাকেন, তাহা হইলে তিনি এই গুহার মধ্যে আছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) ইহাতে শঙ্কিত হইলেন এবং ভাবিলেন, এমন না হয়, দুশমন নবী করীম (সাঃ)-কে দেখিয়া ফেলে এবং দুঃখ দেয়। তাঁহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। যখন রসুল করীম (সাঃ) এই অবস্থা দেখিলেন, তিনি বলিলেন, لا تحزن ا ن الله معنا আবু বকর (রাঃ) তুমি শঙ্কিত হইতেছে কেন? খোদাতায়ালা আমাদের সঙ্গে আছেন। এইরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার এই বিশ্বাস ও প্রত্যয় এই কথার প্রমাণ যে খোদাতায়ালা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ইং ১৯০২ সালে বিরুদ্ধবাদীগণ এক মোকদ্দমা করিয়াছিল। যে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মোকদ্দমা বিচারের জন্য দায়ের ছিল, সে আর্য ছিল। তাহাকে আর্য নেতাগণ লাহোরে ডাকিয়া শপথ দিল যেন সে নিশ্চয় এই মোকদ্দমায় মীর্যা সাহেবের বিরুদ্ধে লেখরামের (মৃত্যুর) প্রতিশোধ গ্রহণ করে। সে তাহার নেতাদের সম্মুখে ইহার প্রতিজ্ঞা করিল। খাজা কামালউদ্দিন সাহেবের নিকট এই বিষয়ের বিস্তারিত সংবাদ পেঁাছিল।

## হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

মোকদ্দমা সম্পর্কে গুরুদাসপুরে অবস্থানরত ছিলেন। খাজা কামালউদ্দিন তাঁহাকে বলিলেন যে, এই মোকদ্দমায় যেমন করিয়া হউক আপোস মীমাংসা করা প্রয়োজন, কারণ ইহা পাকা কথা যে, ম্যাজিষ্ট্রেটকে লাহোর ডাকিয়া তাহার নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা নেওয়া হইয়াছে যে সে যেন নিশ্চয় সাজা দেয় এবং সেও সাজা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) শুইয়াছিলেন। খাজা কামালউদ্দীন সাহেবের কথা লম্বা করার অভ্যাস ছিল। তিনি বলিলেন, হুজুর! নিশ্চয় সে কয়েদের সাজা দিবে। বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত আপোষ করা উত্তম হইবে। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) কনুইয়ের উপর ভর করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, খাজা সাহেব! খোদাতায়ালার সিংহের গায়ে হাত দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে—

আমি খোদাতায়ালার সিংহ।

সে আমার গায়ে হাত দিয়া দেখিয়া লউক! তদনুযায়ী এইরূপই হইল। দুই মেজিষ্ট্রেট এই মোকদ্দমার বিচারের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজনের ছেলে পাগল হইয়া গেল। তাহার স্ত্রী তাহাকে লিখিল (সে হযরত

মসিহ্ মওউদ (আ:)কে মামুর মানিত না) যে, তুমি এক মুসলমান দরবেশের অবমাননা করিয়াছ। তাহার ফলে তোমার এক ছেলে পাগল হইয়া গিয়াছে। এখন দ্বিতীয় ছেলের জন্য হুশিয়ার হইয়া যাও। সে শিক্ষিত ছিল এবং এ সব কথা বিশ্বাস করিত না। সে এদিকে ভ্রুক্ষেপ করিল না। ফলে তাহার দ্বিতীয় ছেলে নদীতে ডুবিয়া মরিল। সে রাবি নদীতে গোসল করিতে গিয়াছিল। সে যখন নদীতে নামিয়া গোসল করিতেছিল, তখন এক কুমীর আসিয়া তাহার পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায় এবং এইভাবে তাহার মৃত্যু ঘটে। সেই ম্যাজিষ্ট্রেট হযরত মসিহ্ মওউদ (আ:)-কে এরূপ কষ্ট দিত যে,

## মোকদ্দমার শুনানীর সময়

সারাক্ষণ তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া রাখিত। পিপাসা লাগিলে তাঁহাকে পানি পান করিতে দিত না। একবার খাজা সাহেব পানি পান করার জন্য অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সে অনুমতি দেয় নাই। পরে তাহার এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল যে সে স্বয়ং আমার নিকট দেওয়ার দরখাস্ত করিল। তখন আমার অল্প বয়স ছিল, বিশ বাইশ বৎসর হইবে। আমি কোথাও যাইবার জন্য যখন ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিলাম, সে আমার নিকট আসিল এবং একঘণ্টা আমার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিল এবং সে দরখাস্ত করিল যে, আমার জন্য দোওয়া করুন যেন এ আযাব যে কোন উপায়ে হউক টলিয়া যায়। দ্বিতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহ্যত: হযরত মসীহ মওউদ (আ:)-কে কোন কষ্ট দেয় নাই, কিন্তু শেষকালে সে তাঁহাকে জরিমানার দণ্ড দেয়। (এই জরিমানা আপিলে মাফ হইয়া যায়—অনুবাদক)। সেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয় এবং চাকরী হইতে বরখাস্ত হয়। এইসব বিষয় স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে যে যে খোদাতায়ালার হইয়া যায়, দুশমন যদি তাহাকে কোন বিপদে ফেলিতে চায়, তাহা হইলে উহা সাময়িক হইবে। সুতরাং এক ঈদ ঐ ব্যক্তির, যে তাহার প্রিয়তম অর্থাৎ খোদাকে লাভ করিয়াছে, এবং ইহা সেই সত্যকার ঈদ ছিল, যাহা সাহাবা (রা:) লাভ করিয়াছিলেন। তেমনিভাবে এই ঈদ খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এবং তাঁহাদের পরে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বর্তমান ছিল। কিন্তু পরে এমন এক যুগ আসিল যে খোদাতায়ালাকে লাভ করা দূরে যাউক, মুসলমানগণ বলিতে আরম্ভ করিল যে, খোদাতায়ালাকে লাভ করাই যায় না এবং তিনি কাহারও সহিত কথা বলেন না, অথচ এখনও খোদাতায়ালা তাঁহার বান্দাগণের সহিত বাক্যালাপ করেন এবং তাহার প্রত্যেক কাজে সাহায্য করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। একবার কোন কষ্টে পড়ি। তখন আমি আমার দোওয়ার মধ্যে শক্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে মনস্থ করিলাম যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কষ্ট দূর না হয়, আমি মাটিতে শয়ন করিব।

আমাদের সুফীগণের মধ্যে এরূপ প্রচলন ছিল। এইভাবে খ্রীষ্টানদের মধ্যেও এরূপ প্রচলন দেখা যায় যে, নিজেকে কোনরূপ কষ্টে ফেলিয়া খোদার করুণা আকর্ষণ করা। যাহা হউক

আমি মনস্থ করিলাম যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার কষ্ট দূর হয়, আমি মাটিতে শয়ন করিব। প্রথম দিন যখন আমি মাটিতে শয়ন করিলাম, আমার চক্ষু সবে বন্ধ হইয়াছিল, আমি দেখিলাম খোদাতায়ালার এক গুণ মানুষের মূর্তি ধরিয়া আমার সম্মুখে আসিল। তাহার হস্তে, তাযা নরম ও পেলব সবুজ ছড়ি ছিল, এবং যেভাবে কেউ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে, সেইরূপ চেহারা করিয়া তিনি ছড়ি উঠাইলেন এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মাহমুদ' চারপাইয়ের উপর শুবে কিনা ? আমার স্মরণ নাই যে, ঐ ছড়ি আমাকে স্পর্শ করিয়াছিল কি না, কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ লাফিয়া চারপাইয়ের উপর যাইবার চেষ্টা করিলাম এবং যখন আমার চক্ষু খুলিল, আমি চারপাইয়ের উপরে ছিলাম। সুতরাং এখনও খোদাতায়ালা নিজ বান্দাগণের সহিত এত মহব্বত করেন যে, তিনি ইহাতে কষ্ট অনুভব করেন যে, কেন বান্দা নিজে নিজেকে কষ্টে ফেলে এবং সে কেন এ কথা ধরিয়া লইয়াছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাঁহার কথা শুনিব না। যাহা হউক এই ঘটনার পর আমার মন হাল্কা হইয়া যায় এবং কষ্ট যাহা ছিল উহা অল্পকাল পরে দূর হইয়া যায়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ কষ্ট কায়েম ছিল, উহা আমার মনের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। আমি বুঝিতেছিলাম যে, খোদাতায়ালা যখন পছন্দ করেন নাই যে, আমি মাটিতে শয়ন করি, এবং আমার কথা জানাইবার জন্য নিজেকে কষ্টে ফেলি, তখন ভবিষ্যতেও তিনি ইহা কিভাবে পছন্দ করিবেন যে, আমি কষ্ট পাই। যাহা হউক, এই সকল উপলক্ষ্যের জন্য সাহাবা (রাঃ) ঈদ পালন করিতেন। উহাদের মধ্যে এক উপলক্ষ্য এই ছিল যে, তাহাদের খোদা প্রাপ্তি ঘটে।

## ঈদ পালনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য

যাহা কুরআন করীম হইতে বুঝা যায়, উহা এই যে, ব্যক্তিগত উন্নতি ছাড়া জাতীয় উন্নতিও এরূপ পরিমাণ লাভ হওয়া যে, জাতি যেদিকে মুখ ফিরাইবে সেই দিকেই বিজয়ের পর বিজয় করতলগত হইবে। সাহাবা (রাঃ) এত বিজয় লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেদিকে মুখ ফিরাইতেন, বিজয় এবং এলাহী সাহায্য তাঁহাদের সঙ্গী হইয়া গিয়াছিল এবং এরূপ মনে হইত যেন তাহারা অসুর, তাঁহারা যেদিকে মুখ ফিরাইতেন পৃথিবীকে সেই দিকেই তাঁহারা পদানত করিয়া যাইতেন। প্রথম বস্তু আধ্যাত্মিক এবং ব্যক্তিগত ছিল এবং শেষোক্ত বস্তু জড় জাতীয় ছিল, যাহার জন্য সাহাবা (রাঃ) ঈদ পালন করিবার অধিকারী ছিলেন।

## তৃতীয় উপলক্ষ্য

ঈদ পালনের ইহা হইত যে, জাতীয় নৈতিক চরিত্র এরূপ উচ্চাঙ্গের হইবে যে, কেহ যেন কাহারও উপর যুলুম না করে এবং প্রত্যেকে বুঝে যে তাহার হক নিরাপদ রহিয়াছে। সাহাবা (রাঃ) নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া এরূপ উচ্চ মার্গে অবস্থিত ছিলেন যে, তাঁহাদের যুগে প্রত্যেক

ব্যক্তির হক নিরাপদ ছিল এবং তাঁহারা কাহারও উপর যুলুম করিতেন না। কিন্তু আজকাল আমরা দেখি যে, বাজারে এক এক পয়সার জন্য ঝগড়া হইয়া যায়।

সাহাবা (রাঃ)-এর অবস্থা এরূপ ছিল যে এক সাহাবী (রাঃ)-এর নিকট এক বৃদ্ধ আসিল এবং বিক্রয়ের জন্য নিজ ঘোড়া পেশ করিল। তিনি বৃদ্ধকে ঘোড়ার দাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে এক হাজার দিনার চাহিল। সাহাবী (রাঃ) বলিলেন আমি ঘোড়া খরিদ করিব কিন্তু এই দাম ঠিক নহে। এই ঘোড়ার দাম দুই হাজার দিনার। বৃদ্ধ গ্রামের দাম বলিতেছিল এবং স্বস্থানে সে ঠিক বলিয়াছিল, কিন্তু সাহাবী (রাঃ) জানিতেন যে শহরে আসিলে জিনিষের মূল্য কিরূপ বাড়িয়া যায়। কিন্তু বৃদ্ধ এক হাজার দিনারের বেশী গ্রহণ করিতে রাজী ছিল না। সেই সাহাবী (রাঃ) দুই হাজার দিনারের কম মূল্য দিতে রাজী ছিলেন না। এবং বলিলেন আমি হারাম খাইব কেন? যেখানে নৈতিক চরিত্র এরূপ সেখানে অন্যের হক কিভাবে মারা যাইতে পারে? যদি কোনো জাতির **নৈতিক চরিত্র এইরূপ উচ্চ মার্গে পৌছায়** তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে মজদুর ইত্যাদিগণের ঝগড়া বিবাদ কেন হইবে এবং যুলুমের ধ্বনি উঠিবে কেন? যাহা হউক ইহা তৃতীয় উপলক্ষ্য, যে জন্য সাহাবা (রাঃ) ঈদ পালন করিবার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহাদের ঈদ সত্যকার ঈদ ছিল। সে যুগের একান্ত সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই দৃশ্য এত বেশী নজরে পড়ে যে, দেখিয়া অবাক হইতে হয়।

যে জাতির মধ্যে এইরূপ লোক পাওয়া যায়, যাহারা খোদাকে লাভ করিয়াছে, যে জাতির মধ্যে এইরূপ লোক পাওয়া যায়, যাহারা কেবল ব্যক্তিগত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিই লাভ করে নাই বরং জাতিগতভাবেও উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং তাহারা যেদিকে মুখ ফিরাইয়াছে বিজয়ের পর বিজয় লাভ করিয়া গিয়াছে, জাতির মধ্যে এরূপ উচ্চ নৈতিক চরিত্রের লোক পাওয়া যায়, যাহাদের যুগে কাহারও হক মারা যাইবার খেয়াল পর্যন্ত সৃষ্টি না হয়, সেই জাতি সত্যকার ঈদ পালন করার অধিকারী, সেই জাতি সত্যকার আনন্দোৎসব করিবার অধিকারী।

পৃথিবীতে কি এখনও এরূপ জাতি পাওয়া যায়? ইহার উত্তর নিশ্চয় "না" হইবে। মোহাম্মদ রসুল (সাঃ) এজন্য ঈদ পালন করিতেন যে, তাঁহার প্রিয়তমকে অর্থাৎ **খোদাতায়ালাকে** তিনি লাভ করিয়াছিলেন এবং মুসলমানগণ এই জন্য ঈদ পালন করিতেন যে, তাহারা তাহাদের পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের হুকুমত পৃথিবীতে কায়েম হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু **প্রশ্ন এই** যে, আজ একজন মুসলমান কেন ঈদ পালন করে? সে কি এই জন্য ঈদ পালন করে যে, তাহার পিতৃপুরুষের সম্পত্তি এক এক করিয়া সব হাত হইতে চলিয়া গিয়াছে? সে কি এই

জন্য আনন্দিত যে আধ্যাত্মিক সম্পদ এক এক করিয়া তাহার হাত হইতে চলিয়া গিয়াছে? সে কি এই জন্য আনন্দিত যে, ন্যায় বিচার হইতে সে হাত ধুইয়া বসিয়া আছে? ব্যাপার কি? সে কোন বিষয়, যে জন্য সে খুশী হইয়া ঈদ পালন করিতেছে? সে কি পরণের জন্য নূতন কাপড় এবং খাইবার জন্য রকম রকমের খাবার পাইয়া আনন্দিত? সত্য কথা এই যে, প্রথম যুগে ঈদ ছিল পুরস্কার এবং এখন উহা কষাঘাত। প্রত্যেক ঈদ, যাহা আসে, আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, বল, তোমরা ঈদ কেন পালন করিতেছ? আমরা অবশ্য বাহ্যিকভাবে ঈদ পালন করিয়া থাকি, কিন্তু উহার উপলক্ষ্য এবং প্রেরণা আমাদের মধ্যে বর্তমান নাই। প্রত্যেক মুসলমান

## মৃত্যু পরের জীবন

সম্বন্ধে বিশ্বাসী। তাহার প্রত্যয় থাক বা না থাক, সে একথা বুঝে যে, একদিন না একদিন সে খোদাতায়ালার সম্মুখে পেশ হইবে এবং সেখানে রসুল করীম (সাঃ)-ও থাকিবেন তাহার

## চিন্তা করা উচিত

যে, সে তাঁহার খেদমতে কি নযরানা লইয়া যাইবে এবং কোন উপহার তাঁহার সম্মুখে হাজির করিবে? তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমার উম্মতের কি অবস্থা ছিল? তখন সে কি এই উত্তর দিবে যে, তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে কোন চিন্তা নাই। যদি সে এই উত্তর দেয়, তাহা হইলে তিনি আবার প্রশ্ন করিবেন, তুমি এ অবস্থার জন্য কি করিয়াছিলে? ইহাতে কি সে এই উত্তর দিবে যে আমি আমার স্ত্রী পুত্র পরিজনদের চিন্তায় মগ্ন ছিলাম, জাতির সংবাদ কিরূপে লইতাম? তাহার এই উত্তরে কি রসুল করীম (সাঃ) সন্তুষ্ট হইবেন এবং তাঁহার দৃষ্টিতে কি ঐ ব্যক্তি কোন সম্মান পাইবে? পৃথিবীতে প্রত্যেক কাজের এক সোপান আছে। রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন:

## ঈমানের তিনটি সোপান আছে।

প্রথম, অন্যায় দেখিলে ক্ষমতা থাকিলে উহার প্রতিকার করিবে। দ্বিতীয়, যদি ক্ষমতা দিয়া উহার প্রতিকার সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে ওয়ায নসীহত করিবে। তৃতীয়, যদি তাহার মধ্যে এ সাহস না থাকে যে ঐ মন্দের বিরুদ্ধে উপদেশ দেয়, তাহা হইলে অন্ততঃ মনে মনে সে যেন উহাকে মন্দ জানে। কিন্তু যদি সে মনেও মন্দ না জানে, তাহা হইলে তাহার ঈমানের কোন মর্যাদা থাকে না। যদি কোন মুসলমান প্রথম দুইটি বিষয়ের কোন একটিও করিতে না পারে, তাহা হইলে সে অন্ততঃ খোদাতায়ালার দরবারে অবনত হইয়া অশ্রুধারা তো বহাইতে পারিবে? যদি মুসলমান এ কাজও করে, তাহা হইলেও ঈদ তাহার জন্য আনন্দের উৎসব, নচেৎ তাহার ঈদ কোন আনন্দের উৎসব নহে।

## আজ তবলীগের ময়দান খালি পড়িয়া আছে ?

যদি তাহারা অন্যদের সম্মুখে ইসলামের খাঁটি শিক্ষাকে তুলিয়া ধরিতে পারে, রসুল করীম ( সাঃ ) এবং সাহাবা ( রাঃ )-এর কুরবানীর কাহিনী সকলের সম্মুখে আনে, তাহা হইলে কোন কারণ নাই যে, দুনিয়ার বিশেষ অংশ ইসলামে দাখিল না হয়। যাহরা এ কাজ করিতে পারে না, তাহারা অর্থিক কুরবানী করুক। তাহারা যদি ইহা করিতে না পারে তাহা হইলে অন্ততঃ রাত্রে …আল্লাহ্‌র দরবারে কাঁদিয়া বলুক যে, হে আল্লাহ, আমি দুর্বল, আমি তোমার পথে না কষ্ট সহ্য করিতে পারি, না আর্থিক কুরবানী পেশ করিতে পারি। আমার কোন ক্ষমতা নাই কিন্তু তোমার সকল ক্ষমতা আছে।

## তুমিই ইসলামের বিজয় দাও

তুমি ইসলামকে সেই বিজয় দাও, যাহা তাহার পূর্বে ছিল। যদি খোদাতায়ালার দরবারে পড়িয়া সে কয়েক বিন্দু অশ্রুও ফেলিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার ঈদ অর্থহীন। প্রকৃতপক্ষে আজকালের ঈদ এক কষাঘাতের রূপে আসে এবং আমাদিগকে বলে, বল! তোমরা কিসের ভিত্তিতে ঈদ পালন কর? আমরা একদিকে এই কথা বলার দাবীদার যে রসুল করীম (সাঃ) আমাদের সরদার (নেতা) এবং অন্যদিকে আমরা তাঁহার সরদারী ছিনাইয়া লওয়া দেখিতেছি। প্রত্যেক স্থানে তাঁহার ধর্ম মযলুম, কিন্তু আমরা নিশ্চিন্ত বসিয়া আছি। সুতরাং আমরা কিসের ঈদ করিতেছি? ইহা এক প্রশ্ন যাহা আমাদের প্রত্যেককে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য।

যদি সত্যকারভাবে আমাদের মধ্যে জানী ও মালী কুরবানীর প্রেরণা পাওয়া যায়, যদি আমরা কাঁদিয়া কাঁদিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সাহায্য চাই তাহা হইলে আমাদের ঈদ সত্যিকার ঈদ এবং আমরা আল্লাহ্‌তায়ালা ও রসুল করীম (সাঃ)-এর সম্মুখে চোখ তুলিয়া চাহিবার যোগ্য। নচেৎ আমাদের ঈদ কিছুই নহে, বরং প্রত্যেক ঈদ আমাদিগকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রাণহীন করিয়া দিবে।

( আলফযল—৮ই এপ্রিল ১৯৫৯ খৃঃ অব্দ )।

অনুবাদ—মোহাম্মাদ,
আমীর বাঃ আঃ আঃ

---

## ঈদ মোবারক

আমরা সকল পাঠক পাঠিকার খেদমতে আন্তরিক ঈদ মোবারকবাদ পেশ করিতেছি এবং এই অনুরোধ জানাইতেছি, আপনাদের পক্ষ হইতে পাক্ষিক আহমদীর চাঁদা সত্বর পাঠাইয়া আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তোষ ভাজন হউন। —ম্যানেজার।

# হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল ঃ হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)
ভাবানুবাদ ঃ মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৫)

## হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে হতেই "মসীহ মওউদ" প্রতিশ্রুত মসীহের আগমন ঃ

আমাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি হলো এই যে, আমরা বিশ্বাস করি যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অনুসারী উম্মতের মধ্য হতে আমাদের মধ্যে "মসীহ মওউদ" বা প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাব হয়েছে।

এ কথা সত্য যে আমরা আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেবকে (পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুর জিলার কাদিয়ান নামক গ্রামের অধিবাসী) প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হিসাবে গ্রহন করেছি।

বলাবাহুল্য যে আমাদের এই বিশ্বাস অন্যান্য মুসলমানদের বিশ্বাসের অনুরূপ নয়। অন্যান্য মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) সশরীরে আসমান হতে নাযেল হবেন অর্থাৎ অবতরণ করবেন।

যেহেতু পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের বর্ণনানুযায়ী হযরত ঈসা (আঃ) অন্যান্য মরণশীল মানুষের ন্যায় এন্তেকাল করেছেন বলে সপ্রমাণিত, সেজন্য মরিয়ম-পুত্র যীশুর পূনরাগমন বলতে সেই যীশুরই সশরীরে পুনরাগমন বুঝাতে পারে না। যীশুর পুনরাগমনের অর্থ নিশ্চয়ই ইহাই যে, যীশুর আত্মিক গুণ ও শক্তি সম্পন্ন অন্য এক ব্যক্তির আগমন হবে। দু হাজার বছর আগেকার যীশুরই সশরীরে পুনরাগমন হবে এরূপে ধারণা নিতান্তই অর্থহীন। ওফাত-প্রাপ্ত নবীদের মধ্য হতে কোন একজনকে খোদাতায়ালা পুনরায় পৃথিবীতে পাঠাবেন এরূপ হতে পারে না। তাঁর সৃষ্ট জগত হতে তিনি কোন ব্যক্তিকে নতুনভাবে পাঠাতে পারেন। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ পোষণ করার অর্থ আল্লাহতায়ালার শক্তি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকা। মরিয়ম-পুত্র যীশুর সশরীরে পৃথিবীতে পুনরাগমন আল্লাহতালার শুধু শক্তিরই নয়, তাঁর প্রজ্ঞার জন্যও অবমানাকর। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক শক্তির জন্যও ইহা অত্যন্ত অবমানাকর। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে আধ্যাত্মিক সংস্কার ও পুণর্জীবনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তজ্জন্য এই উম্মত, হযরত

রসুল করীম (সাঃ)-এর উম্মতের বাহির হতে আগমনকারী অন্য কারো, [ অর্থাৎ হযরত মুসা ( আঃ )-এর উম্মতের নবী ঈসা (আঃ) এর ] মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে পারে না।

যে খৃষ্টানরা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মর্যাদাকে স্বীকার করে না, তাদের এরূপ করা সংগত কারনেই যুক্তিযুক্ত হবে যদি আমরা এই ধারনা পোষণ করতে থাকি যে, আমাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে আমাদিগকে দু, হাজার বছর পূর্বেকার যীশুই পুনরায় আবির্ভূত হয়ে আমাদেরকে নেতৃত্ব দিবেন এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি তা করতে পারবেন না। হযরত রসুল করীম (আঃ)-এর উম্মতের সংস্কারের জন্য তাঁরই উম্মতের এক ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছিল।

তা'হলে হযরত রসুল করীম ( সাঃ ) এর উম্মতের সংস্কারের জন্য তাঁরই উম্মত হতে একজন সংস্কারকের আবির্ভাব হতে পারে না কেন? যদি মুসলমানগনের এই বিশ্বাস থাকে যে, হযরত রসুল করীম ( সাঃ ) এমন একজন নবী যাঁর শরীয়ত কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকবে, তাহ'লে তাঁরা কিছুতেই তাঁদের সংস্কার ও পূণর্জীবনের জন্য একজন ইসরাইলী নবীর পুনরায়গমনকে স্বীকার করতে পারেন না। হযরত রসুল করীম ( সাঃ ) স্বয়ং খাতামান নবীয়ীন অর্থাৎ নবীগণের মোহর। তাঁর আধ্যাত্মিক মহিমা এবং প্রভাব চিরকালের জন্য প্রযোজ্য এবং বলবৎ থাকবে। সকল নবীর উপরে হযরত রসুল করীম ( সাঃ )-এর স্থান। তাঁর উম্মতের সংস্কারের জন্য তাঁর নিজ দৃষ্টান্ত এবং প্রভাব প্রতিপত্তিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাঁরই উম্মত হতে এক ব্যক্তি এসে মুসলমানদের সংস্কার সাধন করাই যুক্তি সংগত। হযরত রসুল করীম ( সাঃ )-এর উম্মতের অন্তর্ভূক্ত এক ব্যক্তির মধ্যমেই আখেরী জামানার জন্য প্রতিশ্রুত আধ্যাত্মিক বিপ্লব হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্য কোন প্রকারে এই কাজ সুসম্পন্ন হতে পারে না।

সুতরাঃ ইহাই ন্যায়সংগত যে হযরত রসুল করীম ( সাঃ )-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগমনকারী মসীহ্‌র আবির্ভাব তাঁর উম্মতের মধ্য হইতেই হওয়া আবশ্যক।

## মসীহ্ এবং মাহদী একই ব্যক্তি

আমরা আর একটি প্রশ্নও এখানে রাখতে পারি এবং তা হলো এই যে, বর্তমান কালের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী দুজন পৃথক ব্যক্তিত্ব কিনা। সাধরণ ধারনা এই যে তাঁরা দুই ব্যক্তি। কিন্তু আমরা সহী হাদীসে দেখিতে পাই যে, হযরত রসুল করীম ( সাঃ ) বলেছেন: لا المهدى الا عيسى (লাল্ মাহদীয়্ ইল্লা ইসা)। অর্থাৎ:— ঈসা ব্যতীত অন্য কোন মাহ্দী নাই (ইবনে মাজা,)। তিনি আবার বলেছেন: كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم و امامكم منكم (কায়ফা আনতুন এযা

নাযলা ফিকুম ইব্নু মারইয়ামা ওয়া ইমামুকুম মেনকুম) অর্থং:—তোমাদের অবস্থা কিরূপ হবে যখন তোমাদের মধ্যে ইব্‌নে মরিয়মের আবির্ভাব হবে এবং তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য হতেই হবে। (বোখারী—কেতাবুল আম্বিয়া, নযুলে ঈসা ইবনে মরিয়ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

উপরোক্ত উদ্ধৃতি হতে এ কথা সুস্পষ্ট যে, হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর সময়ে তিনি ব্যতীত আর কেহ মাহদী হবেন না এবং তিনিই এই উম্মতের ইমাম হবেন—কিন্তু এই উম্মতের মধ্য থেকেই হবেন, বাহির থেকে হবেন না। সুতরাং একজন সত্যিকার মোমেনের উচিৎ এ বিষয়ে সতর্কভাবে চিন্তা ভাবনা করা। যদি কোথাও মসীহ্ ও মাহদী দুই ভিন্ন ব্যক্তিরূপে বর্ণিত হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের উচিৎ—"ল'ল মাহদীয়্ ইল্লা ঈসা" এই সুস্পষ্ট হাদীসের আলোকে অর্থোপলব্ধি করা। তাহলে আমরা অন্যান্য হাদীস সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবো। আমরা বলতে পারি যে, প্রতিশ্রুত ব্যক্তি একজন সাধারণ সংস্কারক অর্থাৎ 'মাহদী' হিসাবে জীবন শুরু করবেন—এবং তারপর তাঁকে মসীহের দায়িত্ব অর্পন করা হবে অর্থাৎ তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ হিসাবে পরিচিত হবেন। যদি আমরা এভাবে ব্যাখ্যা না করি তাহলে আমাদের পক্ষে অন্য কোন প্রকারে হাদীসের বর্ণনা সমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ কোন কোন হাদীসে মসীহ ও মাহদীকে দুই ব্যক্তি এবং কোন কোন হাদীসে একই ব্যক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমোক্ত হাদীস গুলোকে রূপক অর্থে গ্রহণ করলে আপাতঃদৃষ্ট পারস্পরিক বিরোধিতা দূরীভূত হয়। নবীগন বহুক্ষেত্রে রূপক বর্ণনাপদ্ধতি ব্যবহার করেন, আর সেই সকল রূপক বর্ণনা ভবিষ্যদ্বানী সমূহকে অধিকতর অর্থবহ করে তোলে।

## 'নযুল' শব্দের অর্থ ঃ

হাদীস-সমূহে ব্যবহৃত 'নযুল' نزول শব্দের অর্থ নিয়ে অনেকে বিপদে পড়ে থাকেন। 'নযুল' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো অবতীর্ণ হওয়া বা অবতরণ। সুতরাং অনেক লোকের ধারণা এইরূপ দাঁড়িয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ শুধু আসমান হতেই অবতরণ করতে পারেন এবং সেজন্যই হযরত ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে আসমানে জীবিত রাখা হয়েছে।

সৌভাগ্যক্রমে ইহা প্রমাণ করা খুবই সহজ যে, 'নযুল' শব্দটি সর্বদা কোন উচ্চস্থান হতে অবতীর্ণ হওয়া বা অবতরণ করাকে বুঝায় না। ইহার দ্বারা নযুল বা অবতরণের গুরুত্ব এবং সুদূর-প্রসারী তাৎপর্যকে বুঝানো হয়ে থাকে। যে জিনিষটির অবতরণ হওয়ার কথা, তার দ্বারা খোদাতালার পরাক্রম ও শক্তিরই নিদর্শনকে বুঝানো হয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে আমরা পবিত্র কুরআনে সমর্থনকারী যথেষ্ট আয়াত দেখতে পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়কটি আয়াত নিচে দেওয়া হলো:—

"ছুম্মা আনযালাল্লাহু সাকিনাতাহু আলা রাসুলেহী"

অর্থ :—আল্লাহতালা তাঁহার রসুলের উপর শান্তি অবতীর্ণ করেন। (সুরা তাওবা : ২৬)।

"ছুম্মা আনযালা আলায়কুম মেম্ বা' দেল গাম্মে আমানাতান নুয়াসা"

অর্থ :—দুঃখ বেদনার পর তিনি তোমাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করেন— যা তোমাদের একটি দলকে নিদ্রাচ্ছন্ন করে দিল। ( আল-ইমরান : ১৫৫ )।

"ওয়া আনযালা লাকুম মেনাল আনয়ামে ছামানিয়াতা আজওয়াজ।"

অর্থ:—তিনি তোমাদের জন্য আটটি জোড়া গবাদিপশু অবতীর্ণ করেছেন। ( যুমুর : ৭ )।

قد انزلنا عليكم لباسا يورى سواتكم وريشا ( কাদ আনযাল্না আলায়কুম লেবাসাঁই ইউওয়ারি সাওআতেকুম ওয়ারিশা ) অর্থ:—আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য বস্ত্র অবতীর্ণ করেছি যার দ্বারা তোমরা লজ্জা নিবারণ করতে পার। ( সুরা আরাফ : ২৭ )

وانزلنا عليكم المن والسلوى ( ওয়া আনযালনা আলায়কুমল মান্নাওয়াস সালওয়া— )

অর্থ :—আমরা তোমাদের উপর মান্না ওয়া সালওয়া অবতীর্ণ করেছি। ( সুরা বাকার : ৫৮ )

وانزلنا الحديد ( ওয়া আনযালনাল হাদীদা ) অর্থ :—এবং আমরা লৌহ অবতীর্ণ করেছি। ( সুরা হাদীদ : ২৬ )।

আল্লাহ্তায়ালার উপরিল্লিখিত মহাদান সমূহ তথা—শান্তি, পশু-প্রাণী, খাদ্য-দ্রব্য, লৌহ ইত্যাদি জিনিষ পৃথিবীতেই তৈরী হয়। তথাপি এগুলো সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এই মহাদানগুলো আসমান হতে নাযেল বা অবতীর্ণ হয়। ইহাই আল্লাহ্তায়ালার শান এবং মহিমা প্রকাশক কুরআনের বিশেষ বাগবিধি। এই সকল বস্তু পৃথিবীতেই জন্মে। এ সম্বন্ধে কুরআন করীম অস্বীকার করে নাই। তবুও এগুলো রূপকভাবে এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যেন এগুলো আসমান হতেই নাযেল হয়েছে।

হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর আগমন সম্বন্ধে যখন 'নযুল' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে তখন উপরোক্ত অর্থ ব্যতীত ইহার অন্য কোন অর্থ হতে পারে না। ইহার দ্বারা প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর আবির্ভাবের বিশেষ তাৎপর্য, মহিমা ও গুরুত্বকেই বুঝানো হয়েছে। ইহার দ্বারা কোনক্রমেই বুঝায় না যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ আসমান হতে সশরীরে পৃথিবীতে নেমে আসবেন।

আমরা কেন ভুলে যাই যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধেও নযুল শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে: "কাদ আনযালাল্লাহু ইলায়কুম যিক্র'র রাসুলা" অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহতালা তোমাদের নিকট একজন স্মারক বা সম্মান দানকারী রসুল নাযেল করেছেন। ( সুরা তালাক: ১১ )। এখানে আশ্চর্যজনক বিষয় এই যে, 'নযুল' শব্দটি হযরত রসুল করীম (সাঃ) সম্বন্ধে ব্যবহৃত হওয়া সত্বেও তাঁকে সাধারণ মানুষের ন্যায় আগমন করতে হয়েছে— পিতা-মাতার মাধ্যমে জন্ম নিতে হয়েছে, তারপর যথাসময়ে বড়ো হয়ে নবী হয়েছেন। তথাপি 'নযুল' শব্দটি যখন হযরত মসীহ (আঃ) সম্বন্ধে ব্যবহার করা হয়, তখন কেমন করে তাঁর আকাশ হতে সশরীরে আগমন করা বুঝায়? ( ক্রমশঃ )

তু("দাওয়াল আমীর" গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরাজী সংস্করণ Invitation-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)।

# খোদ্দাম ও আতফালের পাতা ঃ (৩)

(বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া কর্তৃক সংকলিত)

## ১। প্রশ্ন উত্তর বিভাগ

প্র: চান্দ্র বৎসর এবং সৌর বৎসরের মাসগুলির নাম লিখুন।

উ: চান্দ্র বৎসর বা "হিজরী কামরী" হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। হিজরতের ঘটনা (৬২২ খৃঃ) হইতে এই সন গণনা করা হইয়া থাকে। মাসগুলির নাম: ১। মুহররম, ২। সফর, ৩। রবিউল-আউয়াল, ৪। রবিউস সানী, ৫। জমাদিউল আওয়াল, ৬। জমাদিউস সানী, ৭। রজব, ৮। শা'বান, ৯। রমযান, ১০। শাওয়াল, ১১। জিলকাদ, ও ১২। জিলহাজ্জ। বর্তমানে হিজরী কামরী ১৩৯৬ সন চলিতেছে।

সৌর বৎসর বা "হিজরী শামসী" হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। ইহাও হিজরতের সময় হইতে গণনা করা হয়। মাসগুলির নাম: ১। সুলাহ, ২। তবলীগ, ৩। আমান, ৪। শাহাদাত, ৫। হিজরত, ৬। ইহসান, ৭। ওফা, ৮। জহুর, ৯। তাবুক, ১০। ইখা, ১১। নবুয়ত, ও ১২। ফাতাহ। বর্তমানে হিজরী শামসী ১৩৫৫ সন চলিতেছে।

সৌর বৎসর অপেক্ষা চান্দ্র বৎসর ১০ দিন ছোট। সেই জন্য প্রতি বৎসর সৌর বৎসরের তুলনায় ১০ দিন আগে ঈদ উদ্‌যাপিত হয়।

## ২। মজলিস বার্তা

### ঢাকা মজলিসের বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত :

বিগত ১২/০/৭৬ তারিখে ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার একদিন ব্যাপী বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বীনী মালুমাত, বক্তৃতা, স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক কার্য বিবরণী পাঠ করেন মোতমেদ জনাব সাইফুর রহমান এবং অভ্যর্থনা ভাষণ দান করেন কায়েদ জনাব রেজাউল করীম। বিভিন্ন বিষয়ে তরবীয়তী বক্তৃতা করেন মৌলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, জনাব মকবুল আহমদ খান, জনাব এ, টি, এম, হক, জনাব শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া, জনাব মাসুদুর রহমান, ও জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। বাদ মগরেব সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মোহতরম জনাব আমীর সাহেব বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। অতঃপর পুরস্কার বিতরণ ও দোয়া করা হয়।

## ফিজি আইল্যাণ্ডের অধিবাসী এবং রাবোয়ায় অধ্যায়নরত জনাব মোহাম্মদ হাফিজ সাহেবের ঢাকায় আগমন ঃ

জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্র ফিজি দ্বীপপুঞ্জের জনাব মোহাম্মদ হাফিজ কয়েকদিনের জন্য ঢাকার আগমন করেন তিনি ঢাকায় অবস্থান কালে বিগত শুক্রবার (৩/৯/৭৬) জু'মার নামাযের পর "ফিজি আইল্যাণ্ডে আহমদীয়াতের প্রচার" সম্পর্কে উর্দু তে ভাষণ দান করেন। এবং ভাষণের পর তিনি উপস্থিত আহমদী ভাইদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। পরের দিন শনিবার মাগরেব নামানের পর আর একটি অধিবেশনে তিনি ইংরাজীতে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। উল্লেখ্য যে, জনাব মোহাম্মদ হাফিজ ছোটবেলা হতে রাবোয়ায় লেখা পড়া করছেন এবং আগামী বৎসর শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া মিশনারী হিসাবে ফিজি আইল্যাণ্ডে ফিরিয়া যাইবে (ইনশাআল্লা)।

---

*বিভিন্ন মজলিসের সকল কয়েদ সাহেব দিগকে জানানো যাইতেছে যে, ''ইসলামী নীতি দর্শন" এবং "ইসলামী ইবাদত" পুস্তকদ্বয়ের বিক্রয় সম্বন্ধে বিস্তারিত রিপোর্ট এবং সকল পাওনা পরিশোধ করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে। সংশ্লিষ্ট কয়েদগণকে জানানো যাইতেছে যে, এ পর্যন্ত অত্র মজলিস হইতে কতগুলি পুস্তক লওয়া হইয়াছে এবং কতগুলি পুস্তকের মূল্য এখন পর্যন্ত অত্র মজলিসে পাঠানো হয় নাই তাহার পূর্ণ বিবরণ ও অবশিষ্ট প্রাপ্য টাকা চৌদ্দ দিনের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

## বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১৯৭৫-৭৬ সনের বার্ষিক ইজতেমা আগামী ২৯, ৩০ ও ৩১ শে অক্টোবর রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার জুমার নামাজের পর হইতে আরম্ভ হইবে। (ইন্শাআল্লাহ)। বাংলাদেশের সমস্ত মজলিসকে উক্ত ইজতেমায় অধিক সংখ্যক খাদেম লইয়া অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

**সুন্দরবন মজলিস ঃ** খোদ্দামুল আহমদীয়া স্থানীয়ভাবে রমজান মাসে পবিত্র কোরআন পাকের দরসের ব্যবস্থা করিয়াছে। এ দরস ১লা রমজান হইতে শুরু হয়।

**কুমিল্লা মজলিস ঃ** গত ১৮/৮/৭৬ ইং তারিখে কুমিল্লা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া এক ওয়াকারে আমল পালন করে। মজলিসের খাদেমগণ উক্ত ওয়াকারে আমলে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

**ঢাকা মজলিস ঃ** ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ১২/৯/৭৬ তারিখে ঢাকায় এক "তবলীগ দিবস" পালন করে। এতদোপলক্ষে ঢাকায় বিভিন্ন স্থানে তবলীগি বই পুস্তক বিতরণ করা হয়। এই প্রোগ্রামে ৩৪ জন খোদ্দাম অংশ গ্রহণ করেন।

## ৩। সেমিনার বার্তা

**ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ মজলিস ঃ** বিগত ৮/৮/৭৬ তারিখ রোজ রবিবার বিকাল ৫ টার পর সম্মিলিতভাবে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ মজলিসের একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে জনাব মাসুদুর রহমান সাহেব "জরুরাতুল ইমাম" পুস্তক হইতে আলোচনা করেন। জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া সাহেব উক্ত আলোচনা পরিচালনা করেন।

সমস্ত মজলিসকে নিয়মিতভাবে মাসিক সেমিনারের ব্যবস্থা করিতে এবং উহার রিপোর্ট পাঠাইতে পুনরায় অনুরোধ করা যাইতেছে।

আগামী ১৭/৯/৭৬ তারিখে ঢাকা দারুত তবলীগে চলতি মাসের মাসিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হইবে। আলোচ্য বিষয় "পরকালের জীবন"। জুমার নামাযের পর উক্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত হইবে। ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও তেজগাঁ মজলিসের সকল সদস্যকে উহাতে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

## ৪। কুরআন ক্লাশ

সুরা বাকারা : আয়াত নম্বর ৬ ও ৭ :—

اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون - ان الذين كفروا
سواء عليهم ءانذرتهم ام لم تنذرهم لا يومنون -

"উলায়েকা আলা হুদাম্মের রাব্বেহিম, ওয়া উলায়েকা হুমুল মুফলেহুন। ইন্নাল্লাযিনা কাফারু সাওয়াউন আল.ইহিম আ-আনযারতা হুম আম্ লাম্ তুনযেরহুম লা ইউমেনুন।)"

শব্দার্থ :—উলায়েকা—ঐ সকল লোক। আলা—উপরে। হুদান—সৎপথ। মিন—হইতে। রাব্বেহিম—তাহাদের রব। মুফলেহুন—সাফল্য লাভকারী। ইন্না—নিশ্চয়। আল্লাযীনা—যাহারা। কাফারু—অবিশ্বাস করিয়াছে। সাওয়াউন—সমান, একই প্রকার। আলাইহিম—তাহাদের উপর বা জন্য। আ—কি, আন্যারতা—তুমি ভয় প্রদর্শন বা সতর্ক কর। হুম—তাহাদিগকে। আম্—অথবা, লাম তুনযেরহুম—তাহাদিগকে সতর্ক না কর। লা-ইউমেনুন—তাহারা বিশ্বাস করিবে না, ঈমান আনিবেনা।

অনুবাদ :—(৬) তাহারাই (অর্থাৎ মুত্তাকীগণই) তাহাদের রবের নিকট হইতে প্রাপ্ত সৎপথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারাই সাফল্য লাভকারী। (৭) নিশ্চয়ই যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে—তাহাদিগকে তোমার সতর্ক করা অথবা সতর্ক না করা উভয়ই সমান—তাহারা বিশ্বাস করিবে না।

## ৫। হাদীসের ক্লাশ

(১) "সাইয়েদুল কাওমে খাদেমুহুম" سيد القوم خادمهم

অর্থ :-জাতির সেবকই জাতির নেতা হইয়া থাকে।

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة

(২) "তালাবুল ইলমে ফারিজাতুন আলা কুল্লে মুসলেমে ওয়া মুসলেমাতেন।"

অর্থ :—প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য জ্ঞান শিক্ষা করা ফরজ।

(৩) "লা ইয়াশকুরুল্লাহা মাল্ লা ইয়াশকুরুন নাসা।

لا يشكر الله من لا يشكر الناس -

অর্থ :—যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ হইতে পারে না।

## ৬। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা :

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন :

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

(ইন্না নাহ্নু নায্ যাল্নায্ যিকরা ওয়া ইন্নালাহু লাহাফেযুন)

অর্থঃ—"আমরাই এই যিকর (কুরআন) অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমরাই ইহার সংরক্ষণকারী।" (সুরা আল-হিজর ; ১০ আয়াত)।

আল্লাহ্তা'লার এই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী বিগত ১৪ শত বৎসর ধরিয়া বাহ্যিকভাবে শত শত হাফিজ পবিত্র কুরআন কণ্ঠস্থ করিয়া আসিতেছেন এবং তাহার ফলে আক্ষরিক ভাবে পবিত্র কুরআন হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর যামানা হইতে আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। পবিত্র কুরআনের সত্যিকার সংরক্ষণ বলিতে শুধু শাব্দিক সংরক্ষণকে বুঝায় না—উহার মূল উদ্দেশ্য ও শিক্ষার সংরক্ষণকেও বুঝায়। তাই আল্লাহ্তায়ালার উপরোক্ত প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী এবং আল্লাহর নিকট হইতে অহী পাইয়া হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় মোজাদ্দেদের আগমন সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন (যাহা আমরা গত মাসে এই পত্রিকায় উল্লেখ করিয়াছি) তদনুযায়ী বর্তমান হিজরী শতাব্দীর মাথায় একজন মোজাদ্দেদ আসা আবশ্যক। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর উপর এই উম্মতের অলী, দরবেশ ও আলেমগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ও এই শতকে

প্রতিশ্রুত মোজাদ্দেদ আসলে সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ যাঁহাকে হাদীসের কেতাব সমূহে "মসীহ ও মাহদী" (আঃ) নাম দেওয়া হইয়াছে। লাল মাহদিয়্যু ইল্লা "ঈসাবনু মরিইয়ামা" অর্থাৎ ঈসা ইবনে মরিয়াম ব্যতিত অন্য কোন মাহদী নাই (ইব্‌নে মাজা) হাদিসের দ্বারাও উক্ত কথাই প্রমাণিত হইতেছে যে, মাহদী ও প্রতিশ্রুত ঈসা একই ব্যক্তি।

আল্লাহতা'লা পবিত্র কুরআনে "ইসলামকে রক্ষা করিব" বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা অলংঘনীয়। মুসলমানগণ আভ্যন্তরীণ দিক দিয়া অসংখ্য দল, উপদল ও ফেরকায় বিভক্ত, অসংখ্য প্রকার কুসংস্কার, কবর-পুজা, পীর-পুজা, নামায, রোজা ইত্যাদির প্রতি অবহেলা, নাচ-গান, সিনেমা, পর্দাহীনতার প্রকোপ ইত্যাদি সমস্যা রহিয়াছে। অন্য দিকে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের নিকট ইসলামের প্রচার কার্যের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এবং যাহারা ইসলামের বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকা ও পুস্তিকাদির মাধ্যমে এবং আরো নানাভাবে কাজ করিতেছে তাহাদের নিকট ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও আদর্শকে তুলিয়া ধরিতে হইবে। এই সকল কাজ আল্লাহ্‌তা'লার ওয়াদা অনুযায়ী এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বর্তমান জামানায় আগমনকারী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) করিয়াছেন এবং বর্তমানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাত শান্তিপূর্ণভাবে ঐ সকল কাজ সম্পাদন করিতেছে।

## ৭। দোয়া ঃ

(১) "রাব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইনলাম তাগফেরলানা ওয়াতারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসেরীন।"

অর্থ—হে আমাদের রব, আমরা আমাদের আত্মার উপর যুলুম করিয়াছি। যদি তুমি আমাদিগকে মাফ না কর এবং আমাদের উপর রহম না কর তাহা হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব।

(২) ইফতারের দোয়া :—"আল্লাহুমা লাকা সুমতু ওয়াবিকা আমানতু ওয়া আলারিযকেকা আফ্‌তারতু।"

অর্থ—হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার জন্যই রোযা রাখিয়াছি, তোমার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং তোমার দেওয়া রিয্‌কের দ্বারা ইফতার করিতেছি।

বিশেষ নির্দেশ—এই সংখ্যায় যে সকল শিক্ষণীয় বিষয় দেওয়া হইয়াছে সেগুলি এক মাসের মধ্যে শিক্ষা করার জন্য সকল খোদ্দাম, আতফাল ও নাসেরাতকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

# সংবাদ

## সুইডেনে নির্মিত প্রথম মসজিদ ঃ
## অত্যন্ত বাবরকত ও আনন্দপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঃ

গোটনবার্গ ( সুইডেন ), ২০ শে আগষ্ট. আজ পবিত্র শুক্রবারে সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) সুইডেনে নির্মিত প্রথম মসজিদটির একান্ত বিনয়নম্র ও মর্মস্পর্শী দোওয়ার সহিত উদ্বোধন করেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

আহ্মদীয়া শত বার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত ইহাই প্রথম মসজিদ। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, স্পেন, হল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, ইণ্ডোনেশিয়া, তুরস্ক, আলবানিয়া, পাকিস্তান এবং আরও কয়েকটি দেশ হইতে আগত প্রায় ছয় শত সদস্য যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এই উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ঈমান উদ্দীপক জুমার খোৎবায় হুজুর (আইঃ) বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে মসজিদের মালিকানা স্বত্ব আল্লাহতায়ালার ; আমাদের পদমর্যাদা কেবল তত্বাবধায়কের। হুজুর ঘোষনা করেন যে, আমাদের মসজিদ সমুহের দুয়ার সকল লোকের জন্য উন্মুক্ত, যাহারা এক ও অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার এবাদত করিতে চাহেন। হুজুর জামাতের সদস্য বৃন্দকে উপদেশ দেন যে, তাঁহারা যেন এই মসজিদটিকে সকল দিক দিয়া যথাসাধ্য পবিত্র রাখেন, যাহাতে খোদার বান্দাগণ পূর্ণ তৃপ্তি ও স্বস্তির সহিত ইহাতে এবাদত করিতে পারেন।

ইতিপূর্বে সুইডেন রেডিওর প্রতিনিধিগণ এক ইন্টারভিউ গ্রহণ করেন। হুজুর একটি সাংবাদিক সম্মেলনেও ভাষণ দান করেন এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিবর্গের প্রশ্নের জওয়াব দেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হইতে তার যোগে শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ সুচক বহু পয়গামও পাওয়া যায়।

হুজুর ( আইঃ)-এর স্বাস্থ্য আল্লাহতায়ালার ফজলে ভাল আছে। তিনি এই পবিত্র অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সকল বন্ধুদিগকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তাহাদিগকে 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ্"-এর মহব্বতপূর্ণ দোওয়া প্রদান করেন।

## সুইডেনে মসজিদ উদ্বোধনীর প্রথম সুমিষ্ট ফল :
## সাতজন যুগোশ্লোভিয়েন ও একজন পাকিস্তানীর হুজুরের হস্তে আহ্মদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ

গোটনবার্গ (সুইডেন) ২৪শে আগষ্ট, আল্লাহ্তায়ালার ফজলে মঙ্গলবার সাতজন যুগোশ্লাভিয়েন এবং একজন পাকিস্তানী সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেসের (আঃ) পবিত্র হস্তে বয়েত করিয়া আহ্মদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

## ইংল্যাণ্ডের আহমদীয়া জামাত সমূহের ১২তম সালানা জলসা লণ্ডনে অনুষ্ঠিত

লণ্ডন : ১১ই আগষ্ট, গ্রেটব্রিটনের আহ্‌মদী জামাত সমূহের ১২তম সালানা জলসা এখানে আল্লাহ্‌তায়ালার আপর অনুগ্রহে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। আল-হামদুলিল্লাহ্। ইহাতে দেশের সকল স্থান হইতে বন্ধুগণ বিপুল সংখ্যায় আসিয়া যোগদান করেন।

এই উপলক্ষ্যে সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুগ্রহ পূর্বক আমেরিকা হইতে জামাতের নামে একটি ঈমান উদ্দীপক পয়গাম প্রেরণ করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, হুজুর তখন আমেরিকা ও কানাডায় সফররত ছিলেন।

## পাকিস্তানের উজিরে আজমের ত্রাণ তহবিলে
## সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেসের দান

রবওয়া, ২৩ শে আগষ্ট—পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর পক্ষ হইতে বন্যাদুর্গতগণের জন্য ত্রাণ তহবিলে সাহায্যদানের যে আহ্বান করা হইয়াছে, উহাতে হুজুর (আইঃ)-এর এরশাদ অনুযায়ী জামাত আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে ত্রিশ হাজার টাকা দান করা হইয়াছে। এবং ব্যক্তিগত ভাবেও বন্ধুগণকে উহাতে অংশগ্রহণ করার জন্য বলা হইয়াছে।

## পাকিস্তানে বন্যাপীড়িতদের মধ্যে আহ্‌মদী যুবকগণের অতুলনীয় ত্রাণ সেবা

রবওয়া, ৯ই আগষ্ট, রবওয়ার চতুঃস্পর্শে বন্যা কবলিত এলাকায় এবং পাকিস্তানের অন্যান্য বন্যা দুর্গত অঞ্চলে আহ্‌মদীগণ দৃষ্টান্ত পূর্ণ ত্রাণকার্য পরিচালনা করেন। রাবওয়ার রেলওয়ে ষ্টেশনে আশ্রয়গ্রহণ কারী চিনিওট ও লালিয়ান (রাবওয়ার দুই পার্শ্ববর্ত্তী বন্যাকবলিত ষ্টেশন হইভে পদব্রজে আগত বহু সংখ্যক মুসাফেরের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর লঙ্গর খানা হইতে খাবার প্রস্তুত করা হয় এবং খোদ্দামগণ তাহাদের মধ্যে উহা বিতরণ করেন। তেমনিভাবে চিনিওটে এক রাত থাকায় পর বন্যার বাধাপ্রাপ্ত হইয়া রবওয়ায় ফিরিয়া আসা ট্রেনের এক হাজার চারশত আঠাত্তর জন মোসাফেরকে লঙ্গর খানা হইতে খাওয়ান হয়। তেমনিভাবে রাবওয়ার বাস ষ্টেণ্ডে বহু আটকা পড়া বাসের বিপুল সংখ্যক মোসাফেরকেও কয়েকবেলা খাদ্য সাপ্লাই করা হয়। এতদ্ব্যতীত, অত্র অঞ্চলের বন্যাকবলিত পাশাপাশি গ্রাম গুলিতে নৌকাযোগে পৌঁছিয়া আহ্‌মদী যুবকগণ (খোদ্দাম) গ্রামবাসীদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। (আল-ফজল হইতে উদ্ধৃত)

অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

# হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ সালেস ( আইঃ )-এর আমেরিকা সফর

## ওয়াশিংটনে হুজুরের সাংবাদিক সাক্ষাৎকার

### ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তারের আসমানী অভিজান ও উহার আনন্দদায়ক সুফল সমূহের উপর সারগর্ভ ঈমান উদ্দীপক আলোচনা

ওয়াশিংটন, ২৭শে জুলাই :

'রিলিজিয়াস নিউজ সার্ভিস'-এর প্রতিনিধি মিঃ জন নভোটনে হুজুর (আইঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার দৃষ্টিতে খ্রীষ্টধর্মের মোকাবেলায় ইসলামে শ্রেষ্ঠতর বিষয় কি আছে যাহা সে এই দেশকে ( আমেরিকাকে ) দিতে পারে? হুজুর বলেন, ইসলাম শুধু দার্শনিক তত্বই বর্ণনা করে না বরং উহা জীবন যাপনের এক বিশেষ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থারও শিক্ষা দেয়, যাহার ফলে জীবন্ত খোদার সহিত মানুষের জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। প্রচলিত খৃষ্টধর্ম খোদার সহিত মানুষের যিন্দা সম্পৃর্ক কায়েম করাইতে পারে না। এক সময় ছিল যখন উহাও খোদার সহিত মানুষের যিন্দা সম্পর্ক কায়েম করাইয়াছিল, কিন্তু এখন উহার মধ্যে আর সেই ক্ষমতা ও যোগ্যতা নাই। যিন্দা খোদার সহিত যিন্দা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া কোন সাধারণ বিষয় নয়, বরং ইহা এক অত্যন্ত মহান ও অনন্যসাধারণ নে'মত, এবং ইসলাম ব্যতীত এই নে'মত অন্য কোনও উপায়ে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ এই যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 'আফজালুর রুসুল' ( শ্রেষ্ঠতম রসুল ) এবং তিনি কামেল শরিয়ত সহকারে আবির্ভূত হইয়াছেন। কুরআন এবং প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে, এবং তাহা এই যে, স্বয়ং খৃষ্টানদের নিজেদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বাইবেল প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। ইহার মোকাবেলায় কুরআন শরীফের একটি শব্দ বা বিন্দু-বিসর্গও পরিবর্তন হয় নাই। ইহা যে শব্দ ও বাক্যে নাযেল হইয়াছিল ঠিক সেই শব্দ ও ভাষাতেই সংরক্ষিত আছে। যদি আমরা যুক্তির দিক হইতেই লক্ষ্য করি, তাহা হইলেও প্রক্ষিপ্ত ও পরিবর্ত্তিত হওয়ার কারণে বাইবেলের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না ; এবং যে ব্যক্তি কোরআন শরিফের উপর আমল করার জন্য প্রস্তুত হয় সে পূর্ণ আস্থার সহিত ইহা বলিতে পারে যে, যদি আমি ইহার উপর আমল করি, তাহা হইলে খোদাতায়ালার

সহিত আমার যিন্দা সম্পর্ক কায়েম হইয়া যাইবে। কিন্তু সহি আমল জরুরী। সুতরাং ইসলাম প্রত্যেক আমেরিকানকে এই মহান শুভ-সংবাদ দান করে যে, সে ইসলামের অনুসরণ করিয়া খোদাতায়ালার সহিত জীবন্ত সম্পর্ক কায়েম করিতে পারে। এবং যখন খোদাতায়ালার সহিত তাহার যিন্দা সম্পর্ক কায়েম হইবে, তখন খোদাতায়ালা তাহার সহিত বাক্যালাপ করিবেন এবং তাহাকে ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর সংবাদ দান করিবেন। এই প্রসঙ্গে হুজুর (আইঃ) হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জীবনী হইতে রুশের জারের শোচনীয় পতন ও সেই দেশে কম্যুনিজমের মাধ্যমে রক্তক্ষয়ী বিপ্লব সংঘটিত হওয়া এবং এ্যাটমবম ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কার এবং বিশ্ব যুদ্ধ সমুহে উহাদের ব্যবহারে অকল্পনীয় ধ্বংসলীলা সম্বন্ধে ১৯০৩ সনেরও পূর্বে ঘোষিত ভবিষ্যদ্বানী সমূহ ও ইহাদের পূর্ণতার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন। হুজুর বলেন যে, ভবিষ্যৎ, মানুষের দৃষ্টির বাহিরে এবং উহার সম্বন্ধে মানুষ তখনই জানিতে পারে যখন খোদাতায়ালা কোন বান্দাকে বাক্যালাপের সৌভাগ্য দান করিয়া উহার সম্বন্ধে তাহাকে অবহিত করেন। এই সেই মহান নে'মত যাহা একমাত্র ইসলামের উপর আমল করিয়াই লাভ করা যাইতে পারে।

উক্ত সাংবাদিক এই বক্তব্যের উপর আর একটি প্রশ্ন করেন যে, খৃষ্টানরাও এই দাবী করেন যে, খৃষ্ট ধর্মের উপর আমল করিয়া খোদার সহিত জীবন্ত সম্পর্ক সৃষ্টি করা যায়। ইহাতে ইসলামের বিশেষত্ব কি? হুজুর (আইঃ) অত্যন্ত জালালের সহিত বলেন যে, শীর্ষস্থানীয় পাদ্রীগণ আমার এই দাবীকে চ্যালেঞ্জ করুন। আমি তাহাদিগকে ইসলামের এই বিশেষত্ব এবং উহার এই শ্রেষ্ঠত্বের তাযা ও নিত্যনতুন আমলী (বাস্তব) প্রমাণ পেশ করার জন্য প্রস্তুত আছি, এবং এতদসঙ্গে ঘোষণাও করিতেছি যে, তাহারা এদিক দিয়াও খৃষ্টধর্মের জীবন ও উহার ফজিলতের কোন আমলী (বাস্তব) প্রমাণ পেশ করিতে পারিবেন না এবং পারেনও না।

সাংবাদিকের আর একটি প্রশ্ন ছিল এই যে, জামাত আহমদীয়া দীর্ঘকাল হইতে আমেরিকায় প্রচার কার্যে তৎপর রহিয়াছে। তেমনিভাবে আরও কিছু ইসলামী সংগঠনও এখানে মজুদ আছে। কিন্তু আমেরিকানগণ এ পর্যন্ত তাহাদের বিশেষ কোন প্রভাব গ্রহণ করে নাই।

হুজুর বলেন, কোন সত্যের প্রচারের প্রাথমিক যুগে সেই সত্যকে গ্রহণকারীদের সংখ্যা কি তাহা মোটেই কোন গুরুত্ব বহন করে না; গুরুত্ব বহন করে এই বিষয়টি যে, পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্যে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন আসিতেছে কি না। ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না যে, যখন হইতে জামাত আহমদীয়া এখানে তবলীগে-ইসলামের কাজ আরম্ভ

করিয়াছে, তখন হইতেই পরিবেশের ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন সাধিত হইয়া আসিতেছে। না তো এখন খ্রীষ্ট-ধর্মের সহিত পূর্বের মত ঘনিষ্ঠতা কোথাও দেখা যায়, না তো ইসলামের বিরুদ্ধে পূর্বের মত কুসংস্কার ও বিরূপভাব পরিলক্ষিত হয়। তেমনি এমনও নয় যে, এখানে কেহ ইসলামকে সত্যরূপে গ্রহণই করে নাই, বরং বেশ এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় এখানকার লোকজন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহারা ক্রমাগত ইসলামে চলিয়া আসিতেছে, যদিও এখনও ইসলাম গ্রহণকারীদের খুব একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যাধিক্য সাধিত হয় নাই তথাপি আমরা এ কথার উপর স্থির বিশ্বাস ও ঈমান রাখি যে, এক দিন আসিবে এবং নিশ্চয়ই আসিবে, যখন পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী অন্যান্য মানবমণ্ডলীর ন্যায় আমেরিকার অধিবাসীগণও দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করিবে। এখানেও ইসলাম প্রাধান্য বিস্তার না করিয়া থাকিবে না। একটি খোদায়ী সুসংবাদের প্রতি ইঙ্গিৎ করিয়া হুজুর (আইঃ) বলেন, ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের দিন এখন সন্নিকট। আমরা আশা রাখি যে, ভবিষ্যৎ পাঁচ বৎসরের ভিতর আমেরিকায় ইসলামের স্বপক্ষে কতকগুলি বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের সুত্রপত হইবে। ইহার পর রাশিয়াতেও তদ্রূপই বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন সমূহ আরম্ভ হইবে। এসব বিষয় কিভাবে সংঘটিত হইবে তাহা আমরা বলিতে পারি না, শুধু ইহা পালিতে পারি যে খোদাতায়ালা উহা আমাদিগকে বলিয়াছেন, এবং তিনি উহা ঘটাইতে পূর্ণ কুদরত ও ক্ষমতা রাখেন। শুধু আমেরিকার অধিবাসীগণই নয় বরং সম্পূর্ণ রাশিয়ান জাতি ইসলাম গ্রহণ করিয়া খোদাতায়ালার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। যেভাবে একটি ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃক্ষ বাহির হইয়া আসে তেমনি ভাবে বীজবৎ বর্ত্তমান সামান্য অবস্থা ও আভাসগুলি হইতে ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রধান্যের মহামাহিরূহ আত্মপ্রকাশ করিবে, এবং পরিপোষণ ও বিকাশ লাভ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর উপর ছড়াইয়া পড়িবে। বর্ত্তমান মুহূর্তে পৃথিবীবাসীর দৃষ্টিতে ঐরূপ আধ্যাত্মিক বিপ্লব অসম্ভব মনে হয়, কিন্তু ভবিষ্যতে সেই বিপ্লব সংঘটিত হওয়া সম্ভাব্য ঘটনাবলীর অন্তর্ভূক্ত এবং আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির দ্বারা উহাকে সংঘটিত হইতে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

অতঃপর সাংবাদিক মিঃ জন নোভোটনে বলেন, খৃষ্টানদের মধ্যেও এই মনোভাব লক্ষ্য করা যায় যে, ধর্মের পুনরুত্থানের সময় নিকটে আসিতেছে, এবং দুনিয়া শীঘ্র ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। ইহার প্রমাণ এই যে, ক্যাথলিক ও প্রাটেষ্ট্যান্ট ফের্কা বা সম্প্রদায়

সমূহ ধর্মীয় মতভেদ পরিত্যাগ করিয়া একে অন্যের নিকটে ভিড়িতেছে এবং পরস্পর একত্রিত হইতেছে। ইহার উত্তরে হুজুর ( আইঃ ) বলেন, ইহা কোন ভাল লক্ষণ নয়। কেননা পারস্পরিক সামঝোতার ইহা এমন একটা নযির, যাহা পরস্পরের মূল ধর্মীয় বিশ্বাস ( আকীদা ) সমূহের রদবদলের উপর স্থাপিত, এবং মূল ধর্মীয় বিশ্বাস সমূহে পরস্পর সমঝোতা প্রকারান্তরে পরাজয়ের ঘোষণারই নামান্তর। এই দৃষ্টি ভঙ্গীতে যদি দেখা যায়, তাহা হইলে এই সত্যই সামনে প্রতিভাত হইয়া উঠে যে, প্রত্যেকটি খৃষ্টান সংস্থার পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া যাইতেছে, এবং মানুষের উপর হইতে উহার প্রভাব ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

সাংবাদিক আরও প্রশ্ন করেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জামাত আহমদীয়ার সদস্যগণ যে হারে বৃদ্ধি লাভ কতিতেছেন তাহা কি জন্মগত সূত্রে সংখ্যা বৃদ্ধি, না নও-মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাবৃদ্ধি? হুজুর বলেন : আল্লাহতায়ালা তাঁহার অপার অনুগ্রহে সর্ব প্রকারেই জামাতের লোক সংখ্যা ও সম্পদ বৃদ্ধিতে বরকত ও আশিস দান করিতেছেন। যেখানে জন্মসূত্রে জামাতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, সেখানে ইহাও একটি বাস্তব সত্য যে, অপরাপর ধর্মের লোকও ইসলাম গ্রহণ করিয়া জামাত আহমদীয়ার মধ্যে শামিল হইতেছে। শুধু ঘানাতেই আহমদীদের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। সেখানে আমরা হাজার হাজার খৃষ্টানকে মুসলমান করিয়াছি। তেমনিভাবে সেখানের প্রাচীন বিকৃত ধর্মাবলম্বী ও ধর্মহীনগণও বিপুল সংখ্যায় তাহাদের পুরান মতবাদ ও পন্থা পরিত্যাগ করিয়া ইসলামে প্রবেশ করিয়াছে। তেমনিভাবে পশ্চিম আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলিতেও জামাত আহমদীয়া হাজার হাজার মানুষকে মুসলমান করিয়াছে। সামগ্রিকভাবে আমরা এ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ আফ্রিকানকে ইসলামে দীক্ষিত করিয়াছি। ইহার মোকাবেলায় এমন দশজন আহমদী মুসলমানও পেশ করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়, যাহাদিগকে খৃষ্টান মিশনগুলি খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দিতে সক্ষম হইয়াছে।

( আল-ফজল, ২৭ শে আগষ্ট, ১৯৭৬ ইং )

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

---

## দোওয়ার এলান

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ! আপনারা ছোট-বড় সকলেই খোদাতায়ালার কাছে জামাতের সামগ্রিক হেফাজত ও সংহতি, সর্ববিধ উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য পূর্ণ এখলাসের সহিত সকাতর দোওয়া জারী রাখিবেন।

বন্ধুগণ! দেশবাশীর শান্তি-শৃঙ্খলা, হেফাজত এবং ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের নিমিত্তে বিশেষভাবে দোওয়া করিতে থাকুন। খোদা হাফেজ।

—আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

# বিভিন্ন সংবাদ

## প্রাকৃতিক দুর্যোগ

### ফিলিপাইনের দ্বীপে অগ্ন্যুৎপাত

ম্যানিলা, ৩রা সেপ্টেম্বর : বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ছোট দ্বীপ তাল আগ্নেয়গিরি ছয় বৎসর শান্ত থাকার পর পুনরায় অগ্ন্যুৎপাত শুরু করিয়াছে। দ্বীপ হইতে ধূম্র নির্গমন শুরু হইলে ব্যাপক অগ্ন্যুদ্গীরণের আশঙ্কায় শত শত লোক ছোট ছোট নৌকা করিয়া মুল ভূখণ্ডে পলাইয়া যায়।

### পাকিস্তানে বন্যা

পাকিস্তানে বন্যা পরিস্থিতির এখনও উন্নতি হয় নাই। পাঞ্জাবে বন্যার দরুন ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। কয়েক শত লোকের প্রাণ হানি ঘটিয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক গৃহ হারা হইয়াছে।

বেলুচিস্তানে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়াছে। বোলান নদীর একটি বিশাল বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার দরুন বহু গ্রাম নিমজ্জিত হইয়াছে। কয়েকটি শহরও হুমকীর সম্মুখীণ বলিয়া জানাইয়াছে বি, বি, সি, ।

সিন্ধু প্রদেশেও বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়াছে। এই প্রদেশের দাহু ও লারকানা জেলায় বন্যার দরুন লক্ষাধিক লোক গৃহ হারা হইয়াছে বলিয়া সরকার জানাইয়াছে।

করাচীতে একটি ছয়তালা দালান ভাঙ্গিয়া পড়িয়া দেড় শতাধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এবং বহু লোক আহত হইয়াছে।

### পশ্চিম বঙ্গ উপকূলে ঘূর্ণিঝড়

১২ই সেপ্টেম্বর : বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি একটি ঘূর্ণিঝড় পশ্চিম বঙ্গ উপকূলের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। বহু সংখ্যক লোক আহত হইয়াছে। শতাধিক লোক নিহত হইয়াছে

### জাপানে 'ফ্রান' ঘূর্ণিঝড়

জাপাান একটি প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় হইয়া গিয়াছে। গত দশ বছরে জাপানে এত প্রচণ্ড আকারেরর ঘূর্ণিঝড় হয় নাই। জান ও মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হইয়াছে! প্লাবন ও ভূমিধ্বস সৃষ্টিকারী এই নতুন ঘূর্ণিঝড়ের নাম দেওয়া হইয়াছে 'ফ্রান ঘূর্ণিঝড়'।
প্রায় দুইশত লোক নিহত ও নিখোজ হইয়াছে। ফসল ও থামারের ক্ষতি হইয়াছে প্রচুর

### ইতালীতে ৪০ বার ভূমিকম্প

১৩ই সেপেটম্বর, গত শনিবার বিকালে ইতালীতে ৪০ বার ভূকম্পন অনুভূত হয়। গত মে মাসের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ইতালী ও উহার পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহে যে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল উহা হইতে সামলাইয়া না উঠিতেই আবার এই সকল ভূমিকম্প সংঘটিত হইল। সরকার ভূমিকম্প বিধবস্ত এলাকাতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন। মে মাসের ভূমিকম্পে গৃহহারা প্রায় অর্ধলক্ষ লোক এখনও তাঁবু ইতালীতে বসবাস করিতেছে। যে সকল ঘর বাড়ী পুনর্নিমীত হইয়াছিল, ঐ গুলি আবার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সর্বত্র আতঙ্ক বিরাজ করিতেছে।

## সিটল শহরে ভূমিকম্প

৩রা সেপ্টেম্বরে বয়টার পরিবেশিত এক খবরে বলা হইয়াছে যে, ওয়াশিংটন রাজ্যের সিটল শহর ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইয়াছে। ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ জানা যায় নাই।

## ইটালীতে আবারও ভূমিকম্প

১৬ই সেপ্টেম্বর, গতকাল ইতালীতে আবারও ভূমিকম্প হয়। দালান কোঠা ধূলিস্মাৎ হয়। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হয়। প্রাথমিকভাবে কিছু সংখ্যক লোকের হতাহতের খবর দেওয়া হইয়াছে। রয়টার জানান, দুইদিনের মধ্যে ৩২ বার ভূমিকম্পনের পর ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকা হইতে লোক অপসারণ শুরু হইয়াছে। গত মে মাস হইতে ঐ অঞ্চলে এ যাবৎ ২১৯ বার ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়াছে। কয়েকটি শহর ও গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

## অষ্ট্রিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ায় ভূকম্পন

১৫ই সেপ্টেম্বরে উত্তর ইতালীতে যে ধারাবাহিক ভূমিকম্প হইয়াছে উহার প্রবল ধাক্কা অষ্ট্রিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়ায় ও অনুভূত হয়। যুগোশ্লাভিয়ার শ্লোভেনিয়ায় ভূমিকম্পটি ৪০ সেকেণ্ডকাল স্থায়ী হয়। ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ জানান হয় নাই।

## ক্যারিবিয়ান দ্বীপে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত

ক্যারিবিয়ান সাগরের গুয়াদেলাপ দ্বীপের সুফ্রিয়ের অগ্নিগরিতে গত মঙ্গলবার রাত্রে অকস্মাৎ অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়। অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপটি ১০ মিনিট ধরিয়া ভূমিকম্পে প্রকম্পিত হইতে থাকে।

## বাংলাদেশে ভূমিকম্পের আশঙ্কা

এশিয়া মহাদেশের সকল শহর বিশেষতঃ বাংলাদেশের শহরগুলি ভূমিকম্প এলাকার মধ্যে পড়িয়াছে বলিয়া জানাইয়াছেন ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা। গত জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে 'এশিয়া উইক' পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ তথ্যাবলীতে বলা হয় যে, ঢাকা, কলিকাতা এবং করাচী শহর প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকম্প জোনের মধ্যেই অবস্থিত। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ভূমিকম্প হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে বলিয়া বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই দেশবাসীকে সতর্ক থাকিতে বলিয়াছেন।

---

## লেবানন পরিস্থিতি

লেবাননে প্রায় সকল রনাঙ্গনে লড়াই চলিতেছে। বৈরুত শহরে মসলিম ও খৃষ্টান এলাকার মধ্যবর্তী তথাকথিত নিরপেক্ষ এলাকার যোগাযোগ স্থলে মোতায়েম কৃত আরব শান্তি-রক্ষী বাহিনীর উপরে খৃষ্টান সৈন্যরা গোলাবর্ষন করিয়াছে। মুসলমানদের কব্জায় ত্রিপলী শহর খৃষ্টান সেনারা অবরোধ করিয়া আছে। যুদ্ধ বিরতির জন্য সামরিক ও কুটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রহিয়াছে। মধ্যস্থতা কারীর অভাব নাই। সম্প্রতি, আরব পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের একটি বৈঠকে একটি আরব শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। আগামী মাসের ১৮ই তারিখে এই সম্মেলন হইবার কথা। একটি আশাপ্রদ খবর হইতেছে যে, লেবানন সমস্যা নিয়া মতানৈক্য নিরসনের জন্য মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এবং সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল্ আসাদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের

সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। উভয় প্রেসিডেন্ট লেবানন সম্পর্কে অদ্যাবধি পরস্পর বিরোধী পথ ও মত অনুসরন করিয়া আসিতেছেন। অবশ্য, ইহাও আশঙ্কা করা হইতেছে যে, সিরিয়ায় বামপন্থী মুসলিম দল সমূহ এবং ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে আরও ব্যাপকতর অভিযান শুরু করিতে পারে। তাস জানাইয়াছে যে, ট্রেড ইউনিয়নসমূহের বিশ্ব ফেডারেশনের সচিবালয় বর্তমান লেবানন পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রাগে প্রচারিত এক ইশতেহারে বলিয়াছেন যে, ফিলিস্তিনী প্রতিরোধ আন্দোলন এবং লেবাননের প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে ধ্বংস করার জন্য একটি মার্কিন—ইসরাইল পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইতেছে। প্রকাশ, লেবাননী খৃষ্টানদের সঙ্গে ইসরাইলীদের নাকি একটি গোপন চুক্তি রহিয়াছে। এই চুক্তির ফলে, ইসরাইলীরা লেবাননে খৃষ্টানদেরকে সর্বপ্রকারে সামরিক মদদ যোগাইতেছে। বর্তমানে ইহা প্রায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, লেবানন সমস্যার সুত্র এখন আর লেবাননের ভূখণ্ডের মধ্যে নাই, আরব জাহানেরও বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আরব নেতারা এই সত্যটি বুঝিতে পারিলেই হয়।

১৫ই সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্ট ফ্রায়জিয়ে মুসলিম প্রধান মন্ত্রী রশীদ কারামীকে পদচ্যুত করিয়া গোঁড়া খৃষ্টান নেতা ক্যামেল শামুনকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। ফলে, লেবাননের বিভক্তের পক্ষ, বোধ করি, উন্মুক্তই হইল।

## খৃষ্টীয় ধর্মমতের মতানৈক্য নিরসনের চেষ্টা

ভিয়েনা, ৬ই সেপ্টেম্বর: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের খৃষ্ট ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সপ্তাহকাল ব্যাপী আলোচনা গতকাল ভিয়েনায় সমাপ্ত হইয়াছে। রোমান ক্যাথলিক এবং প্রাচ্যের অন্যান্য গোঁড়া খৃষ্ট ধর্মমতের মধ্যেকার দেড় হাজার বছরের পুরাতন মতভেদ অবসানের প্রয়াসে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালে ভিয়েনায় এই ধরণের আলোচনার ব্যবস্থা করা হয় প্রথম। বর্তমান আলোচনা ইহার তৃতীয় দফা। রয়টার।

### আগামী বছরে মুসলিম ও খৃষ্টান ধর্মবেত্তাগণের বৈঠক

আবু ধাবী, ১৪ই সেপ্টেম্বর।

আগামী বছরে মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্মবেত্তাগণ এক বৈঠকে মিলিত হইবেন। এই বৈঠক ভ্যাটিকান সিটি অথবা আবু ধাবীতে অনুষ্ঠিত হইবে। ইহাতে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ আঃ) সম্পর্কে খৃষ্টানদের মনোভঙ্গীর আলোচনা হইবে। এই তথ্য পরিবেশন করিয়া ইসলামী কনফারেন্সের সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ আইজুদ্দীন ইব্রাহীম বলেন যে, তিনি সম্প্রতি এক সফরে বিষয়টি লইয়া ভ্যাটিকানে পোপের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন, যখন উল্লিখিত বৈঠক অনুমোদিত হয়।

মুসলমানরা আশা করিতেছেন যে, এই আলোচনা বৈঠকের ফলে রোমান ক্যাথলিকদের কাছ হইতে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ আঃ)-এর নবী হইবার স্বীকৃতি পাওয়া যাইবে। যেমন পাওয়া গিয়াছিল ধর্ম ও নৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামের স্বীকৃতি ১৯৬৫ সালের এক ঘোষনায়। খবর রয়টারের।

# সদকাতুল ফিৎর বা ফিৎরানা

সাদকাতুল ফিৎর বা ফিৎরণা যদি বাহ্যতঃ একটি ক্ষুদ্র বিষয় বলিয়াই মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয় এবং উহার পালনে আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি এবং না পালনে তাঁহার অসন্তুষ্টির কারণ। কেননা ফিৎরানা হুকুল এবাদ সম্পর্কিত ইসলামী আহকামের অন্তর্গত। ইহা মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীলোক এবং বাচ্চাদের উপর, এমনকি নবজাত শিশুর পক্ষ হইতে আদায় করা ফরয বা জরুরী। ইহার পরিমাণ প্রত্যেক সঙ্গতিপূর্ণ ব্যক্তির জন্য আরবী পরিমাপ এক সা', অর্থাৎ প্রায় পৌনে তিন সের শস্য বা উহার দাম নির্ধারণ করা হইয়াছে। যদি কেহ উহা দিতে অপারগ হয় তাহা হইলে উহার অর্ধেক আদায় করিতে পারেন।

ইতিপূর্বে রেশনের দরের হিসাবে পূর্ণহার ৬'০০ টাকা এবং অর্ধেক হার ৩'০০ টাকা ফিৎরানা ঘোষণা করা হইয়াছে। যদি দেশের কোন জায়গায় শস্যের (চাউল) দাম রেশনের দর হইতেও কম হয়, তাহা হইলে সেখানকার বন্ধুগণ স্থানীয় দরে উল্লিখিত পরিমাপে শস্যের মূল্য ধরিয়া ফিৎরানা আদায় করিবেন।

উল্লেখযোগ্য যে, ফিৎরানার আদায় ঈদের কমপক্ষে সপ্তাহ সকলের পূর্বেই হওয়া উচিত, যাহাতে এতীম বিধবা ও অভাবীগণের মধ্যে তাহাদের ঈদের আনন্দে শরীক হওয়ার জন্য যথাসময়ে বিতরণ করা যাইতে পারে।

## ঈদ ফাণ্ড

সৈয়েদেনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর জামানা হইতে এশায়াতে-ইসলামের উদ্দেশ্যে উপার্জনশীল ব্যক্তির জন্য কমপক্ষে প্রতিজনে এক টাকা হারে নির্ধারিত আছে। এজন্য বন্ধুগণ এই ফাণ্ডেও বেশীর বেশী চাঁদা আদায় করিয়া আল্লাহতায়ালার সন্তোষভাজন হউন এবং ঈদের প্রকৃত আনন্দ অর্থাৎ ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসার লাভের আনন্দে অংশ গ্রহণ করুণ।

# জরুরী বিজ্ঞপ্তি

সকল জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব গণকে জানান যাইতেছে যে, তারুয়ার মৌঃ আবদুস সালাম সাহেবকে ইন্সপেক্টর বায়তুলমাল হিসাবে নিযুক্ত করিয়া ৩১ শে জুলাই ১৯৭৬ আহ্মদী সংখ্যায় আপনাদের সকলকে জামাতের কাজে তাহার সহিত সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি নিযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অত্র দফতর হইতে কাগজ-পত্রাদি লইয়া যাইবার পর হইতে বিনা সংবাদে নিরুদ্দেশ আছেন।

অতএব, ইন্সপেক্টর বায়তুলমাল হিসাবে তাহার নিযুক্তি অবিলম্বে বাতিল বলিয়া গণ্য করিবেন এবং তাহাকে জামাতের হিসাব নিকাসের কোন খাতা পত্র পরিদর্শন করিতে অথবা চাঁদা সংগ্রহ করিতে দিবেন না। তিনি যদি কোন জামাত হইতে টাকা পয়সা নিয়া থাকেন তাহাও অবিলম্বে জানাইবেন। ইতি—

খাকসার
ভিজির আলী
জেনারেল সেক্রেটারী
বাঃ আঃ আঃ